

মৈঞ্জি

সৃজনশীল সাহিত্যের চাকা

অব্রে

সাজ্জাদ হোসেন

কাম্পালিক



০১৩৮০০

সাজ্জাদ হোসেন

প্রকাশন : ফোর্মুলা প্রকাশনার দ্বাৰা

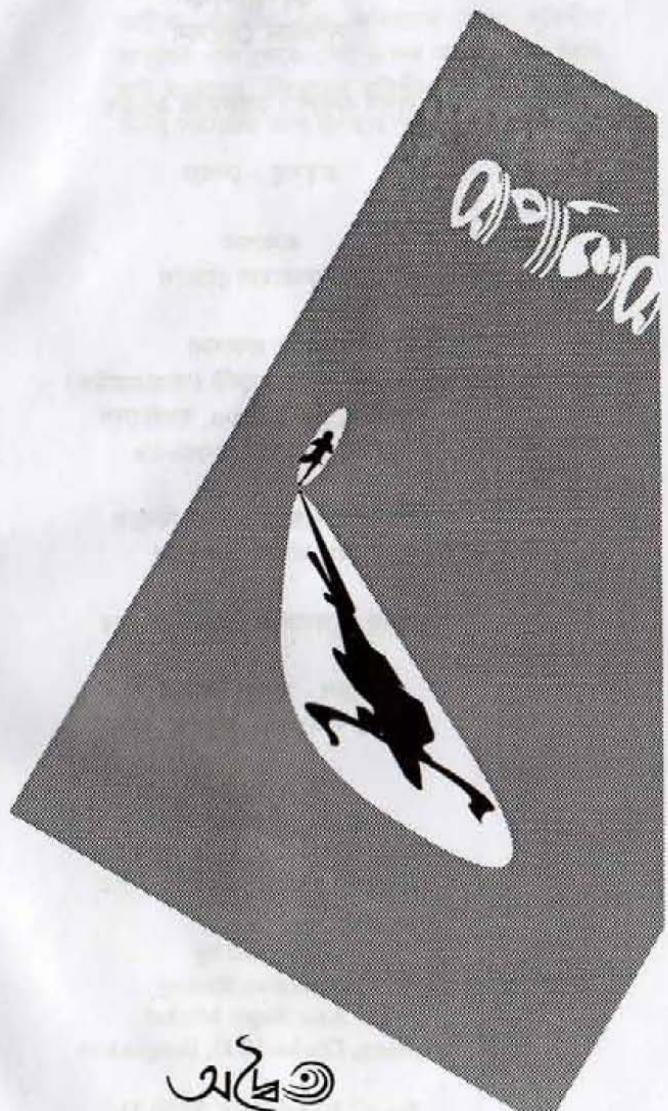


ISBN : 984-300-000194-0

সামাজিক
প্রকাশন কেন্দ্ৰ

অসম
সামাজিক প্রকাশন কেন্দ্ৰ

কাপালিক
সাজাদ হোসেন



অভিযোগ

সুজানশীল সাহিত্যের চাকা

কাপালিক
সাজাদ হোসেন

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৭

এন্টস্বত্ত্ব : লেখক

প্রকাশক
সাইফুজ্জামান শোহাগ

অদ্বৈত প্রকাশনা
৬৫ আজিজ সুপার মার্কেট (আগ্নারগাউড়)
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ০১৭১৭ ৩৩৩৮২৮

লিখন সম্পাদনা ও ফন্ট বিন্যাস
মোঃ আকতার হোসাইন

প্রচ্ছদ : দেবাশীষ হাওলাদার দেব

মুদ্রণ : মাদার প্রিন্টার্স
৮, ১০ নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা

Kapalic
Sazzad Hossain

First Published: February 2007

Published by
Saifuzzman Shohag
65 Aziz Super Market
Shahbag, Dhaka-1000, Bangladesh

Pirce : Bangladesh 70.00 Tk.
Australia 15\$ USA 5\$ India 60 Rupi

উৎসর্গ

অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতে সকল সৃষ্টিশীল
মানুষের পক্ষ থেকে সেই একক সত্ত্বার প্রতি, তিনি
সৃষ্টি করেছেন, দিয়েছেন সৃষ্টিশীল ক্ষমতা, যাবতীয়
মানব সমাজের জন্য উপহার স্বরূপ!

সূচিপত্র

পাঞ্জলিপি বিষয়ক মন্তব্য ... ৭

পূর্জোর ফুল ২৩ ২৪ আলো-আধার

ধূম-তারা ২৫ ২৬ সর্প-চুম্বন

অভিশঙ্গ পরিব্রাজক ২৭ ২৮ চেনা-অচেনা

ভাব শান্ত্র : স্মৃতি-বিস্মৃতি ২৯ ৩০ অপত্য

বৈশাখে জঙ্গলে ৩১ ৩২ মেঘের ফসল

ভাষা প্রাকৃতিক ৩৩ ৩৪ শ্রীমান তাওব

জীবন সংহিতা ৩৫ ৩৬ কপালিক

ধ্যানী ৩৭ ৩৮ অব্যক্ত

হ্যরত নুহ (আঃ)-পবনান্তে ৩৯

ପାଞ୍ଚଲିପି ବିଷୟକ ମନ୍ତର୍ୟ ...

মাননীয়

একটি শিশু। কেবলই বা যখনও সে শিশু। যে, মন্দ গায় এবং পিচ্ছে খোঁ
রিট গুণ মুখ্য স্টেট নিষ্ঠ, তবে টেক্টিক্স হুতুতি কেবল মুখ্য হৃত কুচকে, কেবল
তবে ফুট্টি বিস্তৃত অনুভূতি ও প্রতিক্রিয়া প্রক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হচ্ছে,
মাঝে প্রেছন পদ্ধতি দ্বারা ক্ষেত্রে মাঝে স্টেট, এবং ইন্সেস হুতুতি
চীৎ-চৌফ এক দেখে মন্দ হচ্ছে ওঠ, যখন কী দেখে হচ্ছে ওঠ সে?
যে নি একে দেখে নিষ্ঠ মন্দ হচ্ছে হচ্ছে ওঠ? এবং ক্ষেত্রে কী
মন্দ অঙ্গ ও দল পর্যবেক্ষণ কুম্ভ পথে হচ্ছে ওঠ? না কি চীৎ-চৌফ
ইন্সেস হচ্ছে এ উচ্চতে মেলমুখ দেখে হচ্ছে ওঠ?

এই প্রশ্নগুলুও এ পুঁজুপ্রেহ উচ্চ নিষ্ঠিক অন্যত্ব সমস্যা।
অন্যেই অন্যেই দেখে, এবং অন্যেই নিষ্ঠিক ক্ষেত্রে নিষ্ঠিক মুপ্পত্তি দেখে
মুখ্য থেকে হৃতুক, পুরুষের কুকু প্রেসুপ্রেক্ষ সুপ্রিয় মন্দক হৃতুকে।
কেবল ক্ষিতি দেখে ক্ষেত্রে এর ক্ষেত্রগুলুক উচ্চ নিষ্ঠিক পরিচয় প্রয়োগ
যুক্ত হচ্ছে না। কীভু যেখানে মিষ্টি দেখে দেখে?

শাস্তিক্রিয়িতি ও শাস্তিক্রিয়িতি ও শাস্তিক্রিয়িতি এক খুব শিশু
মন্দদের দেখেম এবং ক্ষেত্রগুলুক্ষণেই মাঝে দেখ কুচকে। ক্ষেত্রগুলু,
ক্ষিতি মাঝে মাঝে মাঝে মাঝে এবং ক্ষেত্রে ক্ষেত্রগুলু(প্রাপ্তিক্রিয়া)
ও ক্ষেত্রে এবং অন্যে ক্ষেত্রে এবং ক্ষেত্রে ক্ষেত্রগুলু প্রাপ্তিক্রিয়া ক্ষেত্রগুলু
শিশু। খুব-চ মাঝে শিশু অন্যে নিষ্ঠিক ও দানিষ্ঠ। ক্ষিতি ক্ষিতিগুলু
শিশু নিষ্ঠিক প্রাপ্তিক্রিয় ক্ষিতি দেখে ক্ষেত্রে ক্ষিতি ক্ষেত্রে পাপ্ত না; ক্ষিতি
মন্দ দেখে ক্ষিতি না, ক্ষিতি ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ক্ষিতি ক্ষেত্রে না, পাপ্ত প্রেসু
মহাযুগ ক্ষিতিক যে ক্ষেত্রগুলু একই অবশ্যক্য ক্ষেত্রে পাপ্ত হচ্ছে
হৃতুক, প্রেসুপ্রেক্ষ নেই আর ক্ষিতি ক্ষেত্রগুলু ক্ষেত্রগুলু মন্দদের
মধ্যে, এবং এ ক্ষেত্রে দেখে প্রাপ্ত হৃতুক। উচ্চতে মাঝেলক-এই
একই ক্ষেত্রে এবং প্রাপ্তিক্রিয় ক্ষেত্রে পাপ্ত দেখে - মাঝে তুমি ক্ষেত্রে হৃতুক
ক্ষিতিক হৃতুক, একই?

আনন্দ দেখে এই মন্দের মন্দক হৃতুকগুলুক হৃতুকগুলু
মধ্যে হৃতুকে, এই ক্ষিতি প্রাপ্তিক্রিয় দিকে অন্যেই হৃতুকগুলুক হৃতুকগুলু
তাহে ক্ষিতিগুলুক দিকে অন্যেই হৃতুক হৃতুক ক্ষিতিগুলুক ক্ষিতিগুলু
ক্ষিতিগুলুক দিকে অন্যেই অন্যেই দিকে শাস্তিক্রিয় দিকে অন্যেই
ক্ষিতিগুলুক দিকে দেখে। এ দেখে ক্ষেত্রগুলুক্ষণ-তুমি ক্ষিতি হৃতুকে
ক্ষেত্রে, এবং ক্ষিতি ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে আপ্ত হৃতুক। দুটো একই সাথে ক্ষেত্রে দেখে
হৃতুক হৃতুক প্রাপ্তিক্রিয় ক্ষিতিগুলুক হৃতুক পাপ্ত। আপ্ত হৃতুক
ক্ষেত্রগুলুক দেখেছি, তখন আপ্ত ক্ষেত্রে দেখেছি? এই ক্ষেত্রে।

একটি শিশু। কেবলই বা যখনও সে শিশু। যে, শব্দে সাড়া দিতে শিখেছে আর হাত পা
মুখে টেনে নিতে, আর ঠোটের বুড়ি বুড়ি চোখের পাতা ভুরু কুচকে, চোখের তারা ঘুরিয়ে
নিজের অনুভূতি ও প্রতিক্রিয়া প্রকাশের প্রতিক্রিয়া শিখেছে, মাথার পেছন দিকে দাঁড়ানো
কারো সাড়া পেয়ে, ঘাড় উল্টো ঘুরিয়ে চীৎ-চোখে তাকে দেখে যখন হেঁসে ওঠে, তখন
কী দেখে হেঁসে ওঠে সে? সে কি তাকে দেখে চিনতে পারার আনন্দে হেঁসে ওঠে? তার
কোনো কথা শুনে ও তার মর্মার্থ বুবাতে পেরে হেঁসে ওঠে? না কি চীৎ-চোখে উল্টো দিক
থেকে বিকট বা উল্টুট চেহারাদৃশ্য দেখে হেঁসে ওঠে?

এই প্রশ্নপুঁজি বা পুঁজপ্রেহের উচ্চর নির্ধারণ অবশ্যই জটিল সমস্যা। আমাদের বয়স্ক চোখ,
যা অনেক কিছুকে কোনো নির্ধারিত স্থাপত্যে দেখা মুখ্য করে রেখেছে। পূর্বদেখার
রেখাগুলোকে স্মৃতিতে পরিণত করেছে তাদের বেলায় কোনো না কোনোটিকে উচ্চর
হিসেবে নির্বাচন করলে অসঙ্গত হবে না। কিন্তু যখনও সে শিশু তার বেলায়?

কালপরিস্থিতি ও বস্তুপরিস্থিতি ও গতিপরিস্থিতির এক ধূর্ব নিশ্চিতে সাজাদ হোসেন তার
কাব্যকাপালিক-এর মাত্রা দাঁড় করিয়েছে। বোঝা যাচ্ছে, ধূর্বই মাত্রা এবং মাত্রাই
কাঠামো এবং তথাসিদ্ধ কাঠামোর (প্রথাসিদ্ধ নয়) ওপরে ভর আরোপ করে সে প্রায়
বিরামহীন প্রতিমার পরিস্থিতি নির্মাণে লিঙ্গ। ধূর্বর সাথে স্থিতির সম্পর্ক নিরিড় ও ঘনিষ্ঠ।
কিন্তু কবিতায় ধূর্ব নির্ধারিত থাকলেও স্থিতি বলে কোনো কিছু থাকতে পারে না। স্থিতির
সহযোগে স্থিতির যে বিরামহীন একটি অল্যক্ষণীয় বিচলন ঘটানো হয়েছে, ঘটনাবস্থার
সেই ক্ষীণ কিন্তু বিরামহীন বিচলনকে সাজাদ কাল, বস্তু ও গতির বেলায় প্রয়োগ
করেছেন। কপালিক-এর একটি চরণে বোধ হয় খানিকটা ধরা যাবে তাকে- নারী তুমি
কাকে খোঁজ? বিন্দু কিংবা বৃক্ত, অবিরত?

সাজাদ তার এই নতুন পদ্ধতি কাঠামোর যে পরীক্ষামূলক কাব্যসংগ্রহ গড়ে তুলেছে, যে
ধূর্বের দিকে আমাদের মনোযোগের ইস্পাতকে তার বিষয়-চৰক দিয়ে আকৃষ্ট করতে
চেয়েছে। কাব্য তার নিজস্ব আলো আর অন্ধকার দিয়ে স্বাভাবিক নিয়মেই সেই
বিরামহীন বিচলন ঘটিয়েছে। এ যেন সেই শাদা-বিজ্ঞান-তুমি স্থির দাঁড়িয়ে আছো, তুব
তোমার চলা থামেনি। দুটো একই সাথে ঘটমান দন্দের ছলনা আমাদের বিভাস্ত খানিকটা
করেই থাকে। আমি যখন তোমাকে দেখছি, তখন আমি কাকে দেখছি? এই রকম।

ପରମତ୍ମ ଦିଲ୍ଲିନ, ମିଶନ୍‌ଟ୍ରେ ଚିତ୍ତନ, ତୁ ଅଭିଜ୍ଞାନକୁ କହିଲୁ ଏହି
କହିଲୁ ଯୁଧର ମେଳ କେତେ ଖେଳ, ନିଯମଖେଳ, ଅଭିଜ୍ଞାନକୁ
କହିଲୁ ନିରୀକ୍ଷଣ ଅବଶ ଅଭିଜ୍ଞାନକୁ କହିଲୁ । କହି ଏହାହି ଆଧୀନ କହିଲୁ
ଏହି, ତୁ ଅଭିଜ୍ଞାନକୁ କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ
ପୁନଃପୁନଃବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ କରି । କହି ପୁନଃବେଳେ ମହାତ୍ମା ମୁହଁ କହି ।

ଏହାହି ଏହି ଅଭିଜ୍ଞାନ ମହା ଏହି ମୋର ଅଭିଜ୍ଞାନକୁ କହିଲୁ
ଏହାହି ଏହି ଅଭିଜ୍ଞାନ ମହା ଏହି ମୋର ଅଭିଜ୍ଞାନକୁ କହିଲୁ
ଏହାହି ଏହି ଅଭିଜ୍ଞାନ ମହା ଏହି ମୋର ଅଭିଜ୍ଞାନକୁ କହିଲୁ ।

ଯେତେବେଳେ ତୁ ଏହି ଅଭିଜ୍ଞାନକୁ କହିଲୁ ଏହି ଅଭିଜ୍ଞାନକୁ
ଏହିରେ ଏହି ଅଭିଜ୍ଞାନକୁ କହିଲୁ ଏହି ଅଭିଜ୍ଞାନକୁ କହିଲୁ
ଏହିରେ ଏହି ଅଭିଜ୍ଞାନକୁ କହିଲୁ ଏହି ଅଭିଜ୍ଞାନକୁ କହିଲୁ
ଏହିରେ ଏହି ଅଭିଜ୍ଞାନକୁ କହିଲୁ ।

ଏହିବେଳେ
୭ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୯୫୫

ମନକେ ବିଜ୍ଞାନ, ସିଦ୍ଧାଂତେ ବିଜ୍ଞାନ, ତବୁ କବିତାଗଲେ କବିତା ବନେଇ ସୁନ୍ଦରେ ମେଘ ଡେକେ
ନିଯେ ଗେଛେ, ନିଯେ ଗେଛେ, ଆରା ବହୁଦୂରେ । ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଅନେକ ଅନେକ ଦୂର ସଫଳ ।
କିଛୁ ଅସତ୍ତ୍ଵ ଆଧାର ଛିଲ ବନେ, ତବୁ ଅନ୍ଧକାରେ ଜେଗେଛିଲ ଶାଦା ତାରାଫୁଲ । ବହୁ ହାନେ ବହୁ
ଶଦେର ପୁନଃପୁନଃବେଳେ କିଛୁଟା କ୍ଲାନ୍ଟ କରେ । ‘କର୍ମପୁରସ୍ଵ’ ଶଦ୍ଦି ସୁନ୍ପଟ୍ ନୟ । ଏକମ ବହୁ
ଅସୁନ୍ଦର ଶଦ ଏବଂ ଯୌଗ ଆମରା ଉତ୍ତରାଧିକାର ସ୍ତରେ ପେଯେ ବ୍ୟବହାର କରାଛି । ଦୁଃଖ ଆର
ଆନନ୍ଦ, ଅପରାଧ ଓ ଶୁଣି ଇତ୍ୟାଦିର ସାଥେ ପାପ-ପୁଣ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ନିରୀହ-ଦେଖତେ ବିଗଦ ଓ
ଆମରା ବୟେ ଚଲେଛି ।

ଆମାଦେର ବୁଝେ ନିତେ ହବେ ଆରୋ ଅଧିକ, ବହୁ ମହାଜନ ଆନନ୍ଦେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାତ୍ୟ ବାହବା କୁଡ଼ାତେ
କୁଡ଼ାତେ ଏଗିଯେ ଯେତେ ଯେତେ- ସୀମନ୍ତ ଛୁଯେ ଗେଛେ କେଉଁ, ଯୌଜନି ତବୁ ବିଧେୟ ଉଦେଶ ।
ଅଭିନନ୍ଦନ ସାଜାଦ ହୋଇନକେ ।

ସମୁଦ୍ର ଗୁଣ
କବି

কু একে মণিশঙ্কর জীব ৮-শুক্ৰ

তাৰ পূজা অৱস্থা গুৰুত্বে সুন্দৰ পুষ্টি।

মেঝে হৃষি কৃষ্ণ দেবৰ মুখ্য মণিশঙ্কর 'where angels
tread' হে-গুৰুত্বে অৱস্থা পুষ্টি পুৰণ
লি চল্ল চেয়ে পুৰ্ণ সাত পুষ্টি একটি অচিকিৎসা
হিচুচি। গান্ধি চৰ্তা দিয়ে পুষ্টি নথি প্রস্তুত
হৃষি মণিশঙ্কর আছ, চৰ্তা
পুৰণ পুষ্টি হয়। এই মণিশঙ্কর
সোনু দেবৰ মুখ্য মণিশঙ্কর, পুৰণ
গুৰুত্বে এন্টি পুষ্টি।

মণিশঙ্কর পুৰণ
৭.০১.০৭

এই গ্রন্থের কবিতাগুলোতে বিবৃত যে অনুভব তাৰ সাথে আমাৰ মানসিক সায়ুজ্য খুব
কম। লেখক হেঁটেছেন এমন সব নীহারিকা-ছায়াপথে 'Where angels fear to tread'.
যে অধিবিদ্যার আবৰণ সূক্ষ্ম আবৰণ ভেদ কৱেও চোখে পড়ে তাৰ কেন্দ্ৰে প্ৰতিক্ৰিয়াশীল
বিশ্বচিৰতন। গাণিতিক চমক দিয়ে সেটুকু ঢাকাৰ প্ৰয়াস বৃথা। হইটম্যানেৰ কবিতাৰ
আনুকৰণ আছে, ফৱৰুক্ষ আহমদেৱ কষ্টব্যৰ অশ্বত নয়। এই কবিতাগুচ্ছেৰ ঘৰ্যাৰ
ভূমিকা লিখতে পাৰবেন আল মাহমুদ, আমি নহি। ব্যৰ্থতাৰ জন্য দৃঢ়থিত।

খন্দকাৰ আশৰাফ হোসেন
বিভাগীয় প্ৰধান, ইংৰেজী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৮৩: ১০ প্রামাণ্যর লিখ। তুম মন ক্ষুণ্ণ অসুস্থ, আমি পরিষেবা
জো সম্পর্কে উচ্চিত বিশ্বাস লিখ না দে। এ সম্পর্কে
ড. শৈল রাম রাম রাম পরিঃ ও অভিজ্ঞতা
১৯৮৩ খন। গবেষণা প্রযোগ 'কাপালিক' প্রতি এ
অনুসূয়া। এখন প্রতিটি প্রতিক মন মনোগত প্রে
শ্ব। প্রতি, প্রতি, প্রতি মনোগত প্রতি মনোগত প্রতি
প্রতি প্রতি প্রতি প্রতি। এ মনোগত প্রতি প্রতি

১৯৮৩ ৬ ডিসেম্বর মনোগত।

গবেষণা প্রযোগ 'কাপালিক' প্রতি প্রতিক মনোগত প্রতি
মনোগত প্রতি মনোগত, এ মনোগত মনোগত প্রতি মনোগত
অনুসূয়া। প্রতি মনোগত প্রতি মনোগত প্রতি মনোগত।
এই প্রতি মনোগত প্রতি মনোগত প্রতি মনোগত। এই প্রতি
মনোগত প্রতি মনোগত প্রতি মনোগত। এই প্রতি মনোগত।

মুখ্য প্রেরণা
১০. ১.

শিল্প স্বতঃস্ফূর্ত প্রণোদনারই বিষয়। তবু নানা ধরনের আয়োজন, প্রাক-পরিকল্পনা তথা
বিচিত্র নিরীক্ষারও বিষয় হয়ে ওঠে তা কখনো কখনো। এর পেছনে কাজ করে স্বকীয়
হয়ে ওঠার তাগিদ ও অভিনবত্ব সংযোজনের আকাঞ্চা। সাজাদ হোসেনের 'কাপালিক'
তেমনই এক আয়োজন। তার সমস্ত ভাবনা-প্রতিমা নির্মিত হয়েছে কবিতাকে কেন্দ্ৰ
করে। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ-এর সঙ্গে সময়কে তিনি স্পষ্টভাবে খচিত করে দিতে চান
কবিতার শৰীরে। এ সম্পর্কে তার নিজস্ব তাড়িক ভাবনা ও বিশ্লেষণ রয়েছে। এর
সবটাই কৌতূহলোদীপক।

সাজাদ হোসেন 'চতুর্থক' নামে কবিতার যে রূপকল্প নির্মাণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন, তার
স্বার্থকতা পরম্পরার সাপেক্ষ বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। এর সাফল্য-ব্যর্থতা
নিরূপণ করবে অনাগত ভবিষ্যত। তবে সাজাদের কাব্য অন্তপ্রাণতার যে পরিচয়
'কাপালিক' এ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় দাবিদার। সাজাদ হোসেনের
আত্মস্তুত আন্তরিক আয়োজন সর্বাংশে সফল হোক-এটাই আমার প্রত্যাশা।

মোঃ খালেদ হোসাইন

কবি, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

নব কাব্য রূপ 'চতুর্থক' বিষয়টি বেশ ঝামেলার মনে হচ্ছে কারণ এই রূপের প্রকাশ ভঙ্গিতে পর্দার্থবিদ্যা এবং গণিতের যে মাত্রা যোগ করা হয়েছে তা নিয়েই বিজ্ঞান সম্পূর্ণ চিন্তামুক্ত নয়। অবশ্য বিনয় মজুমদার, ওবায়দুল ইসলাম, সাইফুল্লাহ্ মাহমুদ দুলাল, ওয়াসিফ-এ-খোদাও গণিতশাস্ত্র নিয়ে কবিতা লিখেছেন। যেমন, সাইফুল্লাহ্ মাহমুদ দুলালের,

পা দু'টো দাও না একটু আদর করি,

৯৮৭৬৫৪৩২১০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০ হাজার বার চুমু খাই ।

কিন্তু এতো গেল গণিত নিয়ে কাব্য চর্চার কথা কিন্তু জ্যামিতি নিয়ে কাব্যরূপ সৃষ্টি করার বিষয়টা সত্যিকার অথেই জটিল। অবশ্য বিজ্ঞানের সাথে এগিয়ে যাবার কবিদের এটা একটা পথ হতে পারে। সাজাদ হোসেন তার 'কাপালিক' কাব্যগ্রন্থে চতুর্থক বলতে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা এবং সময়ের একটা সমন্বয় ঘটিয়েছেন। এখানে যে বিষয় চিন্তা করার তা হলো সময়; কারণ, সময় বিষয়টাই যোলাটে যদিও এর প্রভাব সর্বত্র তারপরও সময় মূলত শূন্য (০)। সাহিত্যে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যত বলতে কিছু থাকলেও সময়ের অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞান আমার তেমন নেই। ইলেকট্রনিকবিদ্যায় হয়তো একটা ইলেকট্রনের স্থায়ীকাল কিংবা বিছুরণের কালকে একটা পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে কিন্তু সমস্ত ক্ষেত্রে তা এক নাও হতে পারে আবার মহাকাশ ক্ষেত্রে সময় একটা বিশাল ব্যাপার। যদিও আইনস্টাইন তার সময় প্রসারন সুত্রে দ্বারা সারা পৃথিবীতেই সময়কে নতুন মাত্রা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু গণিতের খাতা এবং বাস্তবতার মাঝে সহস্র বছরের পার্থক্য। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতার সাথে সময় কোনভাবেই খাপ খেতে পারে না কারণ ত্রিমাত্রিক জগতে, চতুর্মাত্রিক ধারণ করা যায় না যদি সময়কে আমরা মাত্রা হিসেবে ধরি, তবে বাকি তিনটি মাত্রা এর ভেরেরেই থাকে। গবেষকরা এর পক্ষে বিপক্ষে নিজেদের যুক্তিপূর্ণ ধারণা প্রকাশ করেছেন।

অবশ্য সাহিত্যে গণিত বহুকাল পূর্ব হতেই ব্যবহৃত। বেদে জ্যোতিষ শব্দ দ্বারা গণিত কিংবা মহাকাশকে বুঝানো হয়েছে। আবার পিথাগোরাস গণিত দিয়ে মানবিক চরিত্র বর্ণনা করার চেষ্টাও করেছেন এবং মজার ব্যাপার হলো তিনি কোন কোন মাধ্যমে সফলতা হয়েছেন।

কবিতায় মাত্রা, ছন্দের বহু আইন রয়েছে। সময়কে পরিষ্কার করতে পারলে অবশ্যই 'চতুর্থক' একটি বিশ্ব সাহিত্যে নতুন মাত্রা হতে পারে। সন্তোষ একটি অসাধারণ সাহিত্য রূপ কিন্তু তা বিজ্ঞানের সাথে যুক্ত নয় বরং বিশ্ব সাহিত্যে বিজ্ঞান এই প্রথম সরাসরি কবিতায় ঢুকে পড়লো।

সাজাদ হোসেনের মতে, কবিতার প্রথম চার লাইনে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা এবং সময়ের নির্দশন থাকতে হবে তবে কোন লাইনে কবি কোন মাত্রা নিয়ে কাজ করবে সে বিষয়ে কবি উদার। পর্যায়ক্রমে প্রথম লাইনের বিশ্লেষণ হবে ২য় প্যারায়, দ্বিতীয় লাইনের বিশ্লেষণ হবে ৩য় প্যারায়, তৃতীয় লাইনের বিশ্লেষণ হবে ৪র্থ প্যারায় এবং চতুর্থ লাইনের বিশ্লেষণ হবে ৫ম প্যারায় এবং প্রতিটি প্যারাই হবে এক একটি কবিতা। মূল

কবিতার ধারায় শব্দ এবং ছন্দের একটা বিষয় থাকে আর এ বিষয়ে বিভিন্ন জন বিভিন্ন সময় ভিত্তিভাবে এ নিয়ে কচ্ছ কচ্ছ করেছেন। তবে এখন পর্যন্ত কবিতার কোন সংস্কা আমার জানা হয়নি, তাই চতুর্থকের শব্দ এবং ছন্দের প্রতি উদারতা একদিকে যেমন ভাল লেগেছে তেমনি অন্যদিকে পুরো বিষয়টা কি কবিতার বাইরে চলে যায় কিনা সেদিকেও সন্দেহ এনেছে। যদিও কবি বিশ্ব লাইনে কবিতা শেষ এবং প্রতিটি প্যারাকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ কবিতা বলেছেন তারপরও এর দৈর্ঘ্য সম্পর্কে প্রশ্ন না তুললেও প্রস্থ সম্পর্কে একটা প্রশ্ন এসে পড়ে। কারণ গদ্যও দু'এক লাইনে লেখার মনোভাব দেখা যাচ্ছে অনেকের ভেতরে। পুরো বিষয়টা গদ্যের ক্ষেত্রেও হয়ে যেতে পারে মানে ছন্দ এবং মাত্রার প্রতি কবির উদারতা তাকে হয়তো নির্দিষ্ট উদারতার পুরস্কার হিসেবে পরবর্তী কালের কবিদের বিভাস্তি এনে দিতে পারে। কবি তার কবিতায় কোন কোন লাইনে ২২টি শব্দও ব্যবহার করেছেন। পরবর্তীতে যদি কেউ ৫০ কিংবা আরো বেশি শব্দ ব্যবহার করে তবে চতুর্থকের দেওয়া বৈশিষ্ট্য অনুসারে সেটি চতুর্থক হলেও কবিতা হবে না। তাই কবিকে বিজ্ঞানের দিকে কবিতাকে নিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে এ বিষয়েও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, তিনি যেন ভবিষ্যতে কিছু শব্দ না নিয়ে কবিতাই নিয়ে যান। যদিও কবি বলেছেন,

সীমান্ত ছাড়িয়ে এসো, সীমান্তের কথা বলি

-দৈর্ঘ্য

পাহাড়ের গুহা-বন্দরে, সীমান্তের যত ছবি

-প্রস্থ

তোমদের বালিয়াঢ়ী যদিও, সীমান্তের সীমান্তায়

-উচ্চতা

দ্যাখো! আমাদের অন্দরে, মন বন্দরে, জোয়ার-ভাটায়

-সময়।

তারপরও প্রথম তিনটি লাইনে পাঠক যদি বিভ্রান্ত হয় তবে পাঠককে দোষী করা যাবে না, কারণ 'পাহাড়ের গুহা' এবং 'বালিয়াঢ়ী' শব্দ দ্বারা কেউ দৈর্ঘ্যকে বুঝতে পারে। 'বালিয়াঢ়ী' শব্দটি আবার প্রস্থকেও নির্দেশ করে। তাই কবি যদি তার কাব্যে তারই মাত্রাকে সঠিকভাবে সাধারণ পাঠকের কাছে পৌছে দিতে চান তবে অবশ্যই তাকে একটি লক্ষ্য রাখতে হবে।

আসলে সামান্য খুঁত যা থাকে তা এক রকমের গহনার মতই। বৃন্দদের কাজ তা খুঁজে বুলে পড়া চামড়ায় হাত বুলানো। তারপরও সাজাদ হোসেন সত্যিকারেই নতুন কিছু সৃষ্টি করেছেন- একথা অন্যায়ে বলা যায়।

একজন বাঙালি হিসেবে বিশ্ব সাহিত্যে সাজাদ হোসেনের এমন নতুন সংযোজন দেখে এক প্রকার গর্ব বোধ হচ্ছে। দেখা যাক, এ প্রজন্ম এই নতুনকে কিভাবে গ্রহণ করে। কবি সাজাদ হোসেনের দীর্ঘ জীবন কামনা করে শেষ করছি।

শুশান ঠাকুর
কবি, লেখক

সেই প্রাচীন কাল থেকে এ পর্যন্ত কবিতা নিয়ে কম গবেষণা হয়নি! এবং প্রতিনিয়তই কবিতার ধরণ ও ধারনা পরিবর্তন হচ্ছে। এর মাঝেও নতুনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে কোন কবি গঠন করেছেন কবিতার নতুন এবং ব্যক্তিগত গঠনতত্ত্ব। তেমনি কবি সাজাদ হোসেন 'চতুর্থক' নামে তবিতার একটি নতুন গঠনতত্ত্ব তৈরি করেছেন। শুধু তৈরি করেই থেমে থাকেননি; তিনি এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। যে কোন চতুর্থক কবিতা মূলত: চারটি মাত্রা, যথা- দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা এবং সময় নিয়ে গঠিত হয়। এর যে কোন একটির অনুপস্থিতিতে কোন কবিতাই চতুর্থক রূপে গণ্য করা হবে না, এমন অভিমত কবির নিজস্ব।

'চতুর্থক' কবিতায় কবি মাত্রার বাধ্যতা দিলেও এর বিস্তার বিষয়ক কোন বাঁধা প্রদান করেননি। তাবে চারটি মাত্রার সমন্বয়ে গঠিত 'চতুর্থক' কবিতা সাধারণত বিশ্বিত লাইনের মধ্যে শেষ হতে হবে। এর বেশি না, আবার কমও না।

তরুণ কবি সাজাদ হোসেন বর্তমানে অস্ট্রেলীয়া প্রবাসী। সেখান থেকেই তার এই বই প্রকাশ করার প্রয়াস। তার এই নতুনত্ব ও তারণ্য বিশ্ব সাহিত্যের এক নব অধ্যায়ের সূচনা করবে বলে আশা করি।

প্রকাশক

সাইফুজ্জামান সোহাগ

মুখবন্ধ

চতৃর্থক শব্দটির সমাস যদি বিশ্লেষণ করা যায়, তবে বলা যেতে পারে, চতুর্থেই অক্ষ (মুক্তি) পায় যা। এই নামটিকেই আমি বেছে নিয়েছি, কারণ জগতে এই এক নতুন রূপের নামকরণ। 'চতুর্থক' কবিতাই সর্বসাকুল্যে বিশ্বিত লাইনের সীমাবদ্ধতায় পরিপূর্ণতা লাভ করবে। চতুর্থকের প্রথম চারটি লাইন হয় চারটি মাত্রা থেকে। মাত্রাগুলো হচ্ছে: দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা এবং সময়। আমরা সবাই দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা এই তিনটি মাত্রায় দেখে থাকি। সুস্থ কিংবা স্থুল, যে ভাবেই বলি না কেন সময় বলতে আর একটি মাত্রা কিন্তু আবশ্যিক ভাবে থেকে যাচ্ছে। পৃথিবীর অধিবাসী হিসেবে আমরা প্রতিটি দিনের শুরু হতে দেখি সূর্যের আগমনের সাথে সাথে। কাজেই সূর্য নিয়ে নতুন একটা দিন। এই যে একটি দিন শুরু হচ্ছে, এই যে একটি নতুন ভোরের আবির্ভাব, আমরা একটু চিন্তা করলেই তা দেখতে পাই। ধরা যাক, একটি ছেট নদী, যার জল আছে হাঁটু জল উচ্চতায়। যার প্রস্থ বর্ণনা করতে গেলে বলা যেতে পারে, এক টিলে এপাড়-ওপাড়। আর যার দৈর্ঘ্য হয়তো দৃষ্টি সীমানার বইরে। ঠিক এমনি একটি নদীর জল বয়ে যাচ্ছে। ভোরের সূর্যের আলো, জলে পড়ে বিকিমিকি জলছে, অসংখ্য পাখ-পাখালীর ডাক শোনা যাচ্ছে-কান পাতলেই! চারদিক কি আশ্চর্য স্নিফ্ফ একটা আলোয় ভরে উঠেছে। জলের একটা বিশুদ্ধ সুবাস ভেসে আসছে, দূরে মেঠো পথ ধরে রাখাল গরুর পাল নিয়ে যাচ্ছে। হাঙ্কা একটা জলো জলো ঠাণ্ডা হাওয়া ভেসে আসছে, এই তো একটা মাছ লাফ দিল, আবার ডুব দিল জলের ভেতর। ব্যাপারটা একটু ভাবলেই তো দেখা যাচ্ছে, সময়ের সাথে প্রকৃতি একটু একটু করে পরিবর্তন করছে নিজেকে। প্রকৃতি ভীষণ রকম পরিবর্তনশীল। আমরা যে নদীটাকে ঠিক সকাল বেলা দেখলাম, ঠিক ওই নদীটাকে কি আমরা দুপুর বেলা দেখতে পাবো? অবশ্যই না। কারণটা হচ্ছে, দুপুর বেলা আমরা ঠিক একই পারিপার্শ্বিক অবস্থা আশা করতে পারি না। কারণ বেলাটা কিঞ্চিত বেড়ে যাবার সাথে সাথে নদীতে প্রাণের সঞ্চারণ যাবে বেড়ে। অনেক মানুষ আসবে, কেউ নদী পাঢ় হবে, কেউবা গৃহপালিত পশুগুলিকে ধোয়াবার একটা ব্যবস্থা করবে। কাজেই ধীরে ধীরে সেই সকালের শান্ত নিরব নদীটা সরব হয়ে উঠবে। এরই মাঝে আরও কাও ঘটতে পারে। কেউ নদীর ঘাটে এসে পা পিছলে পড়ে গিয়ে, পায়ের একটা ছাপ দেখা গেল, কিন্তু পায়ের ছাপটা যেখানে পড়েছে সেখানে মুহূর্ত মাত্র আগে ঘাস ছিল, খুব স্বাভাবিকই তো মনে হচ্ছে চাঁদ পনের দিন পর অমবস্যা কিংবা জ্যোত্স্না, কোনটা ছেড়ে কোনটার কথা বলি? কাজেই সকাল বেলার যে নদীটা আমরা দেখেছি, যে সিঁফ এক নরম আলো যে আশ্চর্য প্রচন্নতা তৈরি করে, নাড়া দেয় আমাদের হৃদয়ের গোপন গহীন অন্দরে, নদীর জলে সেই আলো প্রতিফলিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে আমাদের পঞ্চইন্দ্রিয়ে, তাতে আমাদের মনে কি একটা ভিন্ন কিছু তৈরি করে না? সেই একই নদীকে যখন বিকেলের বিদায়ী সূর্যের আলোয় বয়ে যেতে দেখি, তখন কি একই

অনুভূতি জন্মায়? জন্মাতে পারে? আমার বিশ্বাস, আমার মত আর সবারই উত্তর হবে, না। একই অনুভূতি দ্বিতীয়বার জন্মাতে পারে না। প্রতিটি মুহূর্তই নিয়ে আসে নতুন মুহূর্তে আগমনী ধ্বনি। সত্যই প্রকৃতি প্রতিটি মুহূর্তেই আমাদের জন্য কি আশ্চর্য দৃশ্য তৈরি করছে, যেন ভীষণ মজার একটা খেলা। তাহলে তো আমরা আক্রেশে বলতে পারি, সময় চতুর্থ মাত্রাই এক নাম।

চতুর্থক অনুভূতির কবিত। চারটি মাত্রাই এর অনুভূতির উৎস- দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা এবং সময়। এই চারটি অনুভূতির মিশ্রণে মূল ভাব প্রকাশ করাই এর মূল লক্ষ্য।

একটি চতুর্থক কবিতার জন্য যে কোন উৎস ব্যবহার করা যায়। অর্থাৎ ঘোলটি অনুভূতির উৎসের যে কোন একটা, যেখানে চারটি মাত্রা- দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা এবং সময় (বিভিন্ন অবস্থানে রেখে বর্ণিত হয়েছে) যে কোন একটি বর্ণনা থেকে শুরু করা যেতে পারে। আর এভাবেই ‘চতুর্থক’ তার ‘চতুর্থক’ নামটি পেল।

চতুর্থক কবিতার গঠনতত্ত্ব :

এই ‘চতুর্থক’ কবিতায় আছে পাঁচটি সুনির্দিষ্ট প্যারায়, যাতে আছে চারটি করে লাইনের সমাবেশ।

প্রথম লাইনের বিশ্লেষণ (re-solution) হবে ২য় প্যারায়

দ্বিতীয় লাইনের বিশ্লেষণ (re-solution) হবে ৩য় প্যারায়

তৃতীয় লাইনের বিশ্লেষণ (re-solution) হবে ৪র্থ প্যারায়

চতুর্থ লাইনের বিশ্লেষণ (re-solution) হবে ৫ম প্যারায় অর্থাৎ শেষ প্যারায় এবং ২য় প্যারায় সারমর্ম মিলিত হবে ৩য় প্যারায়

২য় ও ৩য় প্যারায় সারমর্ম মিলিত হবে ৪র্থ প্যারায়

২য়, ৩য় ও ৪র্থ প্যারায় সম্মিলিত সারমর্ম মিলিত হবে ৫ম প্যারায়

৫ম প্যারায় শেষ লাইনটি হবে চতুর্থক কবিতার সমাপ্তি লাইন এবং যে কথাটি না বললেই নয়, প্রতিটি প্যারাই এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কবিতা।

যেমন ‘চতুর্থক’ কাব্যগ্রন্থের ‘সীমান্তের সীমান্য’ নামক চতুর্থক কবিতাটির সাহায্য নিয়ে বলা যেতে পারে,

সীমান্ত ছাড়িয়ে এসো, সীমান্তের কথা বলি -দৈর্ঘ্য

পাহাড়ের গুহা-বন্দরে, সীমান্তের যত ছবি -প্রস্থ

তোমাদের বালিয়াড়ী যদিও, সীমান্তের সীমান্য -উচ্চতা

দ্যাখো! আমাদের অন্দরে, মন বন্দরে, জোয়ার-ভাটায় -সময়

(এখানে অনুভূতির উৎস (১) কল্পনা করা হয়েছে)

এখানে, দৈর্ঘ্য নির্দেশক লাইনটির বিশ্লেষণ হয়েছে ২য় প্যারায়। অর্থাৎ এসো! সীমানার মুসাফির, এসো এ সীমান্য নিয়ে এসো, সাগরের চেউ, এসো এ সীমান্য আসো, সুর তোল, চৈত্রে, রূপ্ত্বাক্ষের মালায় এই সীমান্তে, আদি-অন্তে, যত সংকোচ রেখে।

এমন ভাবে প্রস্থ নির্দেশিত লাইনটির বিশ্লেষণ হবে ৩য় প্যারায় এবং চতুর্থক নিয়ম অনুসারে। আবার উচ্চতা নির্দেশিত এবং ২য় ও ৩য় প্যারায় সারমর্মটাও মিলিত হবে ৪র্থ প্যারায়। আবার সম নির্দেশক লাইনটির বিশ্লেষণ হবে ৫ম প্যারায় এবং ২য়, ৩য় ও ৪র্থ প্যারায় সারমর্মটাও ৫ম প্যারায় মিলিত হতে হবে এবং সম্পূর্ণ চতুর্থকটাই এই ৫ম প্যারায় শেষ লাইনে গিয়ে অক্তা (মুক্তি) পাবে।

চতুর্থক কাব্যরূপের ব্যাখ্যা:

কাব্য সৌন্দর্যকে নব নব রূপে দেখার ইচ্ছার চেষ্টাটা অপরাধ হলে সে অপরাধে অপরাধী হতে আমার বৰাবৰই আগ্রহ আছে।

চতুর্থক অনুভূতির কবিতা হলেও এর কাব্যরূপে পদার্থ বিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্র অনিবার্যভাবে এসে পড়েছে।

চতুর্থকের পদার্থ বিজ্ঞান ব্যাখ্যা:

বিজ্ঞান কোন ভাবেই প্রকৃতির আওতার বাইরের কোন বিষয় নয়। আর সাহিত্যকে তো প্রকৃতির একটি লেখ্য রূপও বলতে পারি। মাত্রিক এ ধারণা তো পদার্থ বিজ্ঞানেই দেয়া। আর চতুর্থকের শুরুটা হয়েছে চারটা মাত্রার চতুর্মাত্রিকতা থেকে।

চতুর্থকের গাণিতিক ব্যাখ্যা:

চতুর্থকে সর্বসাকুল্যে আছে বিশ্টি লাইন এবং সুনির্দিষ্ট ভাবে আছে পৃথক পৃথক পাঁচটি প্যারায়, যে প্যারায় গুলোর প্রতিটিই এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কবিতা। একটি চতুর্থক এই সম্পূর্ণ পাঁচটি প্যারায় সম্মিলিত রূপ।

চতুর্থকের স্বীকার্যসমূহ:

১. চতুর্থক চারটি মাত্রা নিয়ে গঠিত।
২. একটি মাত্রা আবার চারটি লাইনে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
৩. সম্পূর্ণ চতুর্থক একটি মাত্রা অনুভূতিকেই প্রকাশ করে।

স্বীকার্য ১ অনুসারে চতুর্থকে আছে চারটি মাত্রা অর্থাৎ সংখ্যা ৪। স্বীকার্য ২ অনুসারে চতুর্থকের মাত্রাসমূহ পরবর্তীতে চার লাইনে বিশ্লেষিত হয়েছে এবং এদের সারমর্ম মিলিত হয়েছে পর্যায়ক্রমে আর এক প্যারায়। কাজেই আমরা অবলীলায় বলতে পারি, $1/4 + 1/8 + 1/8 + 1/8 = 1$

শীকার্য ও অনুসারে সম্পূর্ণ চতুর্থকটাই একটি অনুভূতিকেই নির্দেশ করে, কাজেই সংখ্যা
১। এখন, $1+2+3 = 8+1+1 = 6$

এই ৬-ই হচ্ছে সেই ষষ্ঠ অনুভূতি যা কখনও দেখা যায় না। হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে
হয়। চতুর্থক পাঁচটি প্যারার সম্মিলিত রূপ। এই সম্মেলন ষষ্ঠ অনুভূতিকেই নির্দেশ
করে।

চতুর্থক অনুভূতির কবিতা, অনুভূতির ঢোলে-খোলে, চেতন-অচেতনে যে গোপন-প্রকাশ্য
অনুরনন সৃষ্টি হবে, সে অনুরনন, অনুভবেই চতুর্থকের স্বার্থকতা।

লেখক

পূজোর ফুল

আমরা দেখিনি খোপার চুল, ছাঁয়েও দেখিনি রাত্রি
আমরা দেখিনি পূজোর ফুল, তবু আলো-আঁধারের যাত্রী
আমরা দেখিনি মাঞ্জল, দড়িড়া, মানিনি বাঁধা কিংবা প্রহরা
আমাদের স্বরে রাগিনী-ভৈরব, আমাদের চোখে উচ্ছুল জলছবি।

চুলের ভাঁজে, সঙ্ক্ষা-সঁাৰে, সেই আদি ঝর্ণার জলধারা
রাত্রির খাঁজে, আঁধারের বাজে, জুলে রূপবতী চাঁদ
রূপের ভাঁজে, মাতাল হাওয়া, নাচে যত-শত রূপকথারা
যা কিছু দৃশ্যমান, তার সবকিছু ছোঁয়া যায় না, কিছু থাকে চিরকালই অধরা।

জুলে চাঁদ, রাত্রি শেষে ছাই হয়ে, কোন শূন্যে মিশে যায়
সেই ছাই শিশিরের সাথে মন্ত্রণায় একরাশ ফুল নিয়ে আসে
আঁধারের খাঁজে, রাত্রির বাজে, নোঙর তোল হে! আমার মাঝি মাঝা
আঁধার আমার আগে ছোটে, না আমি ছুটি, তার হয়ে যাক এক পাঞ্চা।

মাঞ্জল বাঁধি পূজোর ফুলে, দেকে রাখি তাতে শংকা কিংবা ক্লান্তি
হরিণীর খোঁজে শার্দূল হই কখনও, রূপকথা হয়ে হাঁটি তেপাস্তরে
নোঙ্গর তুলে, সব বাঁধা ভুলে, ছুটে যায় অচেনা মাঞ্জল, নিঃসীম আঁধার
তাই আয় ঘাড় আয়! যদি ঘর উড়ে যায়, সেই শংকা রাখিনি মহাকালের হাহাকারে।

তিনি আছেন, আছেন তিনি, উচ্চ শিখরে! অদৃশ্য আসনে বসে
বিরাজ করেন পূজোর ফুলে, মাঞ্জলে, দৃশ্য-অদৃশ্য সকল নির্দেশ-আদেশে
অস্পর্শ্য জলের সৃষ্টি সকলে, শেষ বর্ষায়, ভেজে শুন্ধতায় অরোর ধারায়
আর তারই সৃষ্টি শ্রেণিগী অভিমানীনির রাগিনী-ভৈরবী ভেসে ভেসে আসে অহর্নিশ।

ଆଲୋ-ଆଧାର

ପବିତ୍ର ଜଳେ, ପବିତ୍ର ହୋକ, ଦେଖଖାନି ଓ ମନଟାଓ
ଖଣ୍ଡର ତୁଳେଛି ବୁକେର ପାଂଜରକେ ଚୋଖ ରାଙ୍ଗିୟେ
କାଁଚା ଲୋହା ଝଲସେ ଉଠେ, ସାଥେ ପୁଣ୍ୟେର ଅମରତୃଟାଓ!
ପାପେର ଆଧାରେ, ପୁଣ୍ୟେର ସେଇ ଆଦିମ ପ୍ରଦୀପ ଜ୍ଞାଲିଯେ ।

ଭବିତବ୍ୟ କୋନ କାଲେଇ, କଥନ ଓ ଛିଲନା ଜାନା,
କାମ, ପ୍ରେମ, ଲୋଭ, ସବ ମନେଇ ତାଦେର ଆଦିମ ଠିକାନା,
ଠିକାନା ବେଡ଼େହେ ତାଦେର, ନତୁନ ରୂପେ, ନତୁନ କୋନ ଭାଷାୟ,
ଯଦିଓ ପବିତ୍ର ହବୋ! ଦେହ ଓ ମନେ, ସେଇ ଆଶାୟ ।

ବାମ ପାଂଜରେଇ! ରମନୀର ନାକି ସୃଷ୍ଟି, ସୃଷ୍ଟିର ସହାୟତାୟ,
ସୃଷ୍ଟି ନାକି! ପ୍ରେମେର ଆବେଶ, ସେଇ ଗାହେର ପାତାୟ ପାତାୟ ।
ଖୁଁଜେ ନାଓ ତାରେ, ତାକାଓ ପବିତ୍ର ଚୋଖେ, ପାଂଜରେ-ଗଭିରେ,
ଖଣ୍ଡର ଚଲେ, ଶୁଦ୍ଧୁଇ ଚଲେ, ଭେତରେ ଏବଂ ବାହିରେ ।

ଠିକାନା ପାବେ, ପୃଥିବୀର ସବ ମାନୁଷେର ବୁକେ ବୁକେ,
ଶୁଦ୍ଧ ସେଇ ବୁକେ କକ୍ଷପଥ ଖୁଁଜେ ନିତେ ହବେ
ଜେନୋ! କାଁଚା ଲୋହା ପୁଡ଼େ, ଶକ୍ତ ହୁଁୟେ ଆସେ ନିରବେ,
ଶେବେ ଝଲସେ ଉଠେ, ପୁଣ୍ୟେର ତାଲେ, ଚୋଖେ, ଖୁଁଜେ ପାବାର ସୁଥେ ।

ଯଦି ପ୍ରଦୀପ ଜ୍ଞାଲାଲେ ତାରାଇ ଏହି ପବିତ୍ର ହଲୋ ଯାରା?
ତବେ! ଭବିତବ୍ୟେ, ଶାବ୍ୟେ-କାବ୍ୟେ, ବହ, ବହ ଯମୁନାର ଧାରା
ଖୁବ ଆଧାର ବେଡ଼େ ଗେଲେ, ଆଧାରଓ ଛୋଟେ, ଆଲୋର ସନ୍ଧାନେ,
ଏ ଆଲୋ-ଆଧାରଇ ପ୍ରଦୀପ ଚେନାଯ, ଜ୍ଞାଲାଯ, ପୃଥିବୀର ନନ୍ଦନେ ।

ଧୂମ-ତାରା

ଅନେକ ତାରାରା ଜଡ଼ୋ ହେଁଛିଲ, ବସେଛିଲ କ୍ଲାନ୍ତ ପଦଭାରେ
ସେଇ ସୁନ୍ଦରେ କବେ, ଯାତ୍ରା ଶୁରୁ ଆମାଦେର ଦିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଫେଲେ!
ଅନେକ ଦୂରେର ପାହାଡ଼, ଜେନୋ! ଛୁଯେ ଯାଇ ବିନ୍ଦୁର ବୃତ୍ତକେ;
ଛୁଟେ ଯାଓଯା ଧୂମକେତୁ ଆଜି ଓ ଖୁଁଜେ ଫେରେ କାକେ? ଚୋଖେର ଆଲୋ ଜ୍ଞେଲେ ।

ତାରାଦେର ଚୋଖେ ଚୋଖେ ବୁଝି ଛିଲ ଶଂକା ଅନିମେସ,
କ୍ଲାନ୍ତ ଚୋଖେର କୋନେ, ସ୍ଵଷ୍ଟି ଖୁଁଜିନି, ଅବକାଶ ଛିଲ ନା କୋନ ଭାବେ
ପଦଭାରେ, ଏଗିଯେ ଗେଛେ, ଯାଦେର ନଦୀ, ସାଗର ମହାଦେଶ,
ତାରାଓ ଛିନ୍ନଭିନ୍ନ, ଅପେକ୍ଷାର ତୋଡ଼େ, ଚିହ୍ନଗୁଲୋ ରେଖେ ।

ହେଁଟେ ଗେଛି, ନିଯେ ଗେଛେ, ସମୟ! ସୁଦୂରେର ଦିକେ ଦୃଷ୍ଟି ତବୁ ଛିଲ
ଆବାଦେର ସମୟ, ଥାକେନି କ୍ଲାନ୍ତି, ରାଖିନି ଅବସାଦ!
ଚୋଖେର ତାରା ଶଂକିତ? ସେ କି? ଶଂକା କୋଥାୟ ଥାକେ?
ଆମରା ଛୁଯେଛି ଶଂକା! ତବୁ ଖୁଁଜିନି ଶଂକାର ବାଡ଼ି-ଘର ।

ସୂର୍ୟ ହେଁଟେଛ, ଏକାଧାରେ, ବହ ବହ ପଲକ! ଅପଲକେ!
ପାହାଡ଼ ଦେଖେହେ ତାରେ? ନାକି ଛୁଯେ ଗେଛେ ଶୁଦ୍ଧ ତାକେ ।
ଯଦି-ବା ସନ୍ଧ୍ୟା, ବିରମ୍ବ, ବନ୍ଧ୍ୟା ନାରୀର ମତ!
ନାରୀ ତୁମି କାକେ ଖୋଜ? ବିନ୍ଦୁ କିଂବା ବୃତ୍ତ, ଅବିରତ?

ତାରାଦେର ପାଯେ ବେଡ଼ୀ ଛିଲ ନାକି, ବୁଝି ସୀମାନ୍ତ ହଲ ଶେଷ!
ସୀମାନ୍ତ ଛୁଯେ ଗେଛେ କେଟେ, ଖୋଜେନି ତବୁ ବିଧେଯ ଉଦ୍ଦେଶ,
ଶୀର୍ଘବିନ୍ଦୁ ଶୂନ୍ୟେ ଥାକେ କି? ବିନ୍ଦୁର ସରେ ଘରେ!
ତବୁ ପଲକେ ପଲକେ, ସେଇ ଧୂମକେତୁର ଶୁରୁ, ମହାକାଳେର ଘାଡ଼େ ।

সর্প-চুম্বন

সাপ দেখেছ সাপড়ে! সাপের চুম্ব দেখনি
সাপড়ে হলে! এখনও ওদের চুম্বটা খাওয়া শেখনি?
শীত-শাপের কোপানলে, সুদিনের পথ কি আঁকাবাঁকা?
নাকি, শাপ-শাপান্তে, মাটির খাঁজে, সব বিষটুকু হয় রাখা?

সাপড়ের বীন অন্তবিহীন, বুঝি একা একাই বাজে,
তাই নাকি? হ্ম, খুব চিন্তা হয় আজকাল, কাজে-অকাজে,
চুমুর কথায়ই ফিরে আসি বারবার,
যখন ওষ্ঠে নাচে, তাদের কোমল শীৎকার

চুমুর কথাটাও, বহু বহু ভাগে বিভাজ্য,
বুঝি ভূমির গানে, সাপের নৃত্য, ভীষণ অপরিহার্য,
বিন্দুর শোক! জেনো, বিন্দুকে যায় ছুঁয়ে
নাকি, সরল রেখাই সব বিন্দুর দৃঢ়কে দিল ধুয়ে?

বিন্দুকে নিয়ে, এলো এ সাপড়ে, উৎসের কল্পনায়,
মাটির গর্ত, প্রথম শর্ত, সাপ ও শাপের আঙ্গনায়,
শৈত্য-শাপের আনাগোনা, পথের কোনে কোনে,
ভূমিটাই, দংশিত হয়, এখানে ওখানে

মা- বিষহরি? নাকি ভূমিটাই সব বিষটাকে নিল শুষে
দেহের ভাঁজে, খাঁজে খাঁজে, সেই যৌবন উঠে ফুঁসে
শাপের বাড়ি, সাপের ঘরে, আম্বৃত্যকাল নাচে
খুলে গেলে বাঁপি, পাপে-পৃণ্যে, হৃদয়ের উষ্ণ কোমল আঁচে।

অভিশপ্ত পরিব্রাজক

আমি ছায়াপথের বাসিন্দা নই, তবু নীহারিকার কক্ষ পথ থেকে পথে হাঁটি আক্রেশে
আমি স্বরূপের সন্ধানে উত্তর-দক্ষিণ মেরু চষে ফেলি এক নিঃশ্঵াসে
আমার প্রহরী শহরগুলি, ধূলি হয়ে মিশে যায়, বিগত সভ্যতাগুলির পথ ধরে
আমি স্বরূপের সন্ধানে, উত্তরে খুঁজে ফিরি, প্রশ্নের আড়ালে, মহাকালের ঘরে।

আমি মিঞ্চিওয়ের মত তুচ্ছে তুষ্ট, হ্বার মত, চিন্তা রাখিনি মনের শরীরে
আমি অধরে রাখিনি গঁজের উপমা, কবিতার ছায়াপাত
আমি প্রহরে-পলকে, ছুটে যাই, নতুন সভ্যতার মৃদু আঁচে
আজও বুকের গহীনে, আমার, হারিয়ে যাবার রক্ত কণিকা নাচে

আমি আমাকে সন্ধান করেছি, উত্তর-দক্ষিণে, পুর-পশ্চিমে
আমি হেঁটে গেছি কোনাকুনি, মেঠো আল ধরে, বন্দরে-শহরে
আমি প্রহর-পলকে, ছুটে গেছি, অদ্ভুত কোন অভিশাপ ঘাড়ে নিয়ে
আমি বর্ণিত হই, কালের অক্ষরে, কিংবা কৃষক মজুরের শুক্ষ অধরে

আমার স্বভাবে ছিল ঐকতানের রেশ, তবে উদ্দেশ ছিল না, কবে কোথায়?
আমার শহরে-নগরে, জুলে কত শত দীপ, যদিও অনুঘাটিত উত্তাপে
এ পথে ও পথে ঘুরে, অদ্ভুত ক্লান্ত তবু নির্ভার নগরের জানালায়
শহরের ধূলোময়, পথে রেখেছি, আবীর! রক্তের নির্দয় আকৃতি, শিশুর আর্তচিত্কার।

কামাগু! আমায় ছাই করেনি, যদিও পথের বাঁকে এসে, তাই অবহেলিত চিরকাল
আমরণ, পথের স্নোতে, দুঁটো হাত পেতে দিয়েছি, এ যাযাবর ধাবমান আকাশে
স্ব-আবিষ্কারের নেশায় যেন, হেন প্রশ্ন করিনি, রাখিনি ধ্বংস-উৎসবের রাতে
বিন্দুর শোকে, বৃত্তের আলোড়ন, প্রশ্নোভরে, নিরবে-নিভৃত, নতুন সূর্যের চিরন্তন আভাতে।

বিস্মিত হই, যদিও তার পুরো বিবরণ আজও হয়নি শোনা
মাকড়সার জালের মধ্যেরখায়, তত্ত্ব কথার জ্বালে ক্রমশ জড়িয়ে পড়ি
এপর থেকে ওপারের অন্তুত দ্বকে, চেনা শিকারের পায়ে ফেলি দড়ি
বিবিধ শঙ্কা, হতাশা, ভয়, ব্যথা, বড় দুঃখে সহসাই উর্ধ্বে তুলে ধরে ফণা।

বিষ্ময়ের ঘোর কাটে না, হাঁটে না, তবু রটে যায় হাট-বাজারে
অজানার, আজব জ্বালা, জ্বল্পন-পিদিম, হৃদয়ের মাঝ কোঠরে
সে আকার খোঁজে না, নিরাকার সংগোপনে বাঁধে না সৃষ্টি জীবন-মরনে
তার মর্মভেদ, আপন খেদে, বিধি বিধানের, হিসাব ও নিকাশে

মধ্যেরখা, আঁকতে শেখেনি হয়ত কোন প্রাণী, জানি অজানার ঘোর-আকালে
এ ধ্যানের অসীম যাত্রা, মাত্রা হারায় বারেবারে, মননের ভাস্তু ঘর-দুয়ার
আকার, তাঁর বাহন হয়নি জানি, জ্ঞান যাতনার অ্যাচিত ঢাক-চোলে
তত্ত্ব-সত্য, তবে জীবন ব্রত নয়, সন্ধান করি তারে আলো-আঁধারের মায়াজালে

যারে চিনি নাই আমি, তারে তত্ত্বের দ্বকে, বাঁধতে চাইনি; বলে
তারে কিনি নাই কোন কালে, আলো-আঁধারের নিঃসীম দিঘলয়ে
হাট-বাজারের, চোলে-খোলে, উদ্ভৃত বাণী হয়ে, না রক্ত না মাংসের ক্ষয়ে
তার ক্ষয় নাই, মাথা নত করি, আজন্ম নয় তো আম্তুকালের উল্লাসে

শংকার ডঙ্কা, ভয় ও ব্যথায়, হৃদয়ের রণে, যাপিত জীবনের অভিশাপে
বিস্মিত সৃষ্টির সমন্ত নমুনা, ব্যস্ত হয়ে উঠে, নিরাকারের গৃহ-সাধনায়
অসীম যাত্রা, কখনও মাত্রা হারিয়ে, ভাস্তু হয়েছে, সূক্ষ্ম-শূলের অন্তুত হিসাবে
দুঃখের কিংবা সুখের তাড়না, চেনা-অচেনায়, ভাবুক হয়, তবু ভাবনার ঘরদোরে।

ভাব শাস্ত্র : স্মৃতি-বিস্মৃতি

বিস্মরণেই স্মরণের, উল্লাস! নাকি নিত্য বাড়ে দিন
দিনে; দিনে নিয়ে আসে, আশা, বাড়ে দিন বদলের ঝণ
নিঃস্বেরা নাকি বিশ্বকে দেখে, বিশাল চোখের তারায়
ভাবুক যারা, তারাই, হিসেবে এনেছে গণিত নিঃসীম।

স্মরণের ঘাড়ে ন্যূন্য করে, বসবাস করে সময়
সময়? সে তো পলক ফেলে না, হিম ঝলকেরও ছায়ায়
স্মরণ যদিও এক ঝলকের কান্না! হয়তো হাসি;
মানুষ অভ্যাসের দাস? কে জানে! লিঙ্গ ভেদে দাসী!

দিন ছুঁয়েছে, রাত্রির অমানিশা, দিনের শেষের বেলায়
আশা-নিরাশা, উল্লাসিত; দিন যাপনের খেলায়
গণিত বুব না, শোনিতেই, ঘোরে হিসেবের ঘড়বাড়ি
আশা-নিরাশার, ধরা বেদনার্তে, দু'পাড়ের আহাজারি

সুদ বেড়েছে চক্রে চক্রে, রং হারিয়ে নিঃস্ব যাদের চোখ,
তার শোক করবার ইচ্ছেও নিশ্চুপ হয়ে গেছে চুপিসারে
সময়-গণিত, স্মরণে থাকে না হিসেবের ঘরে ঘরে
হিসেবের খেরোখাতায় স্মৃতি চমকায় বারে বারে

আর্য ভট্ট নই আমি, তবু শূন্য নিয়ে ভাবি
শূন্য দর্শনে পথে নামি, জানি এটাই কালের দাবি
সব শাস্ত্রেই লুকিয়ে রাখার ব্যাপার কিন্তু থাকে;
শুধু ভাব শাস্ত্রে, তুমি-আমি ঘুরি স্মৃতি-বিস্মৃতির বাঁকে।

অপত্য

(কহলীল জিবরান'র দ্যা প্রফেট পড়ে উৎসাহি হয়ে এই কবিতা,
তাই কহলীল জিবরানকে উৎসর্গ করা হলো)

তারা আগমন করে, আসতেই থাকে, শিকড় বেয়ে বেয়ে,
তারা নামে, নামতেই থাকে, ওষ্ঠাধরের নিগৃঢ় উভাপে,
তারা রেখে আসে পরিচয়, সুদৃঢ় আসমানের সুউচ্চ বলয়ে,
তারা পরিচয় নিয়ে আসে, তোমাদের মাধ্যমে, যদিও তারা তোমাদের নয়।

আগমনী ধৰনি শুনি, সৰ্বশক্তিমানের শক্তিময় নাম শুনে
আমরা শুনতে পাই, তাদের ও আমাদের রূহ রাখা ছিল সুউচ্চ মাকানে
আমরাও ছিলাম, একদিন; অতঃপর ধমনীতে আদেশ নামে
অৰ্মন কর! ভাল মন্দে, তবে পুণ্য নিয়ে এসো সৰ্বশক্তিমানের সমীপে।

ওষ্ঠ ও অধরের নিবিড় সম্মিলন, উত্পন্ন হয়ে একসময় ভীষণ আবেগে শীতল হয়
উষ্ণ ও শীতলের দৃঢ় বন্ধন; তাদের রূহ-কে ধারণ করে চেতন কিংবা অচেতনে
তারা ধারা রক্ষা করে, জিন ও প্রকৃতির সম্যাব্যবস্থার জন্যে বহমান সময়ের সাথে,
আমাদের মত তারাও আসে, নিগৃঢ় ভালবাসা নিয়ে দেহের প্রতিটি কোনে কোনে

প্রতিটি আকাশ উর্ধ্বাকাশের দিকে উচ্চতা ভিন্ন, নিচুতা ঝুঁজে পায় না,
তারা আদিষ্ট হয়ে সুদৃঢ় আসমান ধারণ করে সৃষ্টির আদিতে
তিথিতে তিথিতে, সমরে-শান্তিতে, সমস্ত বলয়সমূহের অধিকর্তার সমীপে
রূহগণ শীকার করে, তুমি ভিন্ন অধিকর্তা নাই, আদি কিংবা অন্তে।

পূর্ববর্তীগণ, কিংবা তারও অনেক আগের পূর্বসূরীদের ধমনীতে
পরিচিত হয় মাকানের সব রূহ, প্রমনে-বিশামে, ক্ষিণকের ত্বক্ষি যায়াবর
শীকারে শিকার করে ফেলা যায়, যাবতীয় হিংসা, ক্রোধ, পৃথিবীর দোষগুলি
অতঃপর রূহ সমাঞ্চ করে এই দৃশ্যমান ধারাপাত, জমিনসমূহের বুকে তখন এক নতুন
- ধূলি ভরা খুলি।

বৈশাখে জঙ্গলে

বেনো জলে, জুলছে আগুন মাঝ রাতের হাওয়ায়,
সাধু-সন্ত, সবই জানত, তবু তারা মনকে কেন আজও পোড়ায়?
ধূপের গন্ধ, ছড়িয়ে পড়ে, জঙ্গলের কোনে কোনে,
বৃক্ষ ও অভিজ্ঞ গুনীনেরা, তাই বুঝি মগ্ন আজও ধ্যানে,

বন কি জানে বনান্ত? আদি-অন্ত, নিঃশেষ?
বনের আগে উড়ে এলো, চুপিচুপি সাত মহাদেশ।
আগুন দেখেনি চোখ, তবে উভাপ খোঁজে কোথায়,
বুঝি জীনের তাপ বেনো জলে, নাকি হেথায় কিংবা হোথায়।

এসো গহীনের কথা বলি! আরও, আরও অনেক গহীনে
মহাদেশ ছেড়ে দেশের ভেতরে, প্রাণে, বেনো জলে, গোপনে
সাধু-সন্তের সুণ্ঠ ছিল না পথের চিহ্ন, বুনো পথের রেখায়,
গুণ্ঠ কি ছিল রহস্যেরা? দেখা কিংবা না দেখায়।

ধূপের গন্ধ ঠিকই ছড়ায়, গড়ায় নিজের মত,
বিস্তৃত হয়, বারো মাসের বাসনাকে নিয়ে
কাম শুধা এখানে, একসাথে হেঁটে যাওয়ায় রত, জঙ্গলের কোনে কোনে,
রাত বাড়ে, দুর্বল ও সবলের, মিলিত চিৎকারে, গহীনের গহীনে।

এখানে খুন হয় প্রয়োজনে, মাঝ রাতে, নিরেট দুপুরে, সন্ধ্যার আলো-আঁধারে,
গুনীনের ঘামে সিক্ত হয়ে আসে, নির্বিবাদী গছের শিকড়
শান্ত, শান্ত হয়ে আসে বন, প্রকৃতির সব, সব কটা রূপ মেখে,
বুঝি সময় গড়িয়ে চলে সময়ের সাথে, সময়ের চলে যাওয়া দেখে।

মেঘের ফসল

ফসল তুলিনি, আজও, বুঝি বানের জলে সব গেছে ভেসে
মেঘ দেখিনি, পুরের হাওয়া, তারে নিয়ে গেছে কোন দেশে
কোন দেশে তারে খুঁজিনি, সেটাও ভবিনি কখনও অবশ্যে
ফসল ও মেঘ তুলব, দেখব, আসছি! আসছে নতুন মাসে।

গোপনে রোপন করা ফসল, জমি ছেড়ে চলে গেছি, আর কোন জমিতে
নতুন কোন জমির খোঁজে, পেছনে তাকিয়ে দেখা হয়নি, কোন দিন কখনও,
বান এসেছে, হয়তো নিয়ে গেছে, সব, শালিকেরা, কোন ফাঁকে গেছে উড়ে
সুদূরে হাতছানি দিয়ে ডেকে গেছে, ফসলের হিসেবী, পরিপক্ষ কাল।

ফসলকে ঢেকে দিয়েছে, সময়ের নাতিশীতোষ্ণ মেঘের ছায়া,
জমির বাঁকে বাঁকে আল ছিল না কোনও, ডাঙকেরা ডেকে ডেকে ঘুম দিয়েছে কবে
পুরের তেপান্তরের ঘোড়ার গাড়ি, ধূলো উড়িয়েছে বারে বারে, আল গড়েছে একাধারে
হাওয়ায় শালিক-ডাঙকেরা, ডেকে ডেকে বলে গেছে, হবে একদিন আমাদেরই হবে!

হেমন্তের উল্লাস নিয়ে ফসল হেসেছে, ছুঁয়েও দেখিনি কোন কালে
সব উল্লাস, বান হয়ে ভেসে গেছে, ভীষণ মঙ্গার ধান এবং চালে।
পৃথিবীর সব বাঁশিওয়ালার কাঁধে, কাঁধ রেখেছি বাঁশিওয়ালার সুরে
তবু সুন্দরের মেঘ ডেকে নিয়ে গেছে, নিয়ে গেছে, আরও বহু দূরে।

তেপান্তরেও উলট পালট ঘটে, অসময়ে শালিক ঘুম ভেঙে জেগে উঠে,
ঐ মঙ্গার ধান, ডাঙক আর শালিক, জমিতেই? নাকি অনাহারী বার মাস!
যোজন যোজন ভেসে গেছি বানের জলে, ছিল না কোনও অবকাশ
হঠাৎ চেয়ে দেখি মেঘের ফসলে, আসল নকলে, ঐ আকাশ নিঃসীম ইতিহাস।

ভাষা প্রাকৃতিক

চন্দ দেখেছি সুরের করতলে, প্রকৃতির গোপন বেদীমূলে
তার উৎস ছুটেছে শূন্যের অভিমুখে, সব কটা বর্ণমালা ভুলে
সেই বর্ণমালা কান্না ভুলে গেছে, তবু সে আজও প্রকাশ্যে চোখ মোছে,
বুঝি দেখা-অদেখা, রেখা টেনে নিয়ে গেছে দূরে, প্রকৃতির গোপন চন্দ-সুরে

মৃদুমন্দ হাওয়া বয়ে যায় চুপিসারে, আসমুদ্র হিমাচলের পাড়ে
চন্দ চলেছে সেই সুরের পিছু, সেই পাড়ে লেখা সূত্র কিছু কিছু!
গন্তব্য থাকে সবকিছু এককালে, মৃদুমন্দে সুর-চন্দের অভিসারে
আমাদের সূর্য প্রভাতে প্রভাতে, আলো নিয়ে আসে অগোচরে

আসমুদ্র হিমাচল যদি উৎসের ভাষা হয়, বুঝি বিক্ষিপ্ত কিছু নয়
বর্ণমালা স্বাধীন! উৎসমুখে একদিন সে বাঁধা ছিল মহাশূন্যের বুকে
তাকে ভুলে যাওয়া মানে বর্ণাঙ্কের কোন প্রতীক-উপমা নয়
জেনো! একদিন চন্দ-সুরে, মৃদুমন্দে সেই সূর্যেরও হয় ক্ষয়।

বর্ণমালার বর্ণে বর্ণে প্রকৃতির যত রং
কান্নার রং মিশে থাকা সভ্যতা যতশত
সব সভ্যতাই একদিন, সাদা কালো হয়ে গেছে, হয়ে গেছে ছবি
সূর্যালোকে তবু, আঁধারের চাঁদ আজও প্রকাশ্যে আলোকিত।

আলো-ছায়াতেই বুঝি চলে, বর্ণিল রূপের দেখা-অদেখার কারিগর
তড়িঘড়ি সুরে, নামে ছন্দ, বজ্র নিদায় সমচিন্তার আলাপনে
সাম্যাবস্থা চিরদিনই, সেই শূন্যের প্রাকৃতিক উৎসের ঘরে
পৃথিবীর সব প্রাণী তবু ঠিকই চুমু খায় সেই প্রকৃতির প্রাকৃতিক অধরে।

শ্রীমান তাণ্ডব

নাচাই সমুদ্র আঙুলি হেলনে, সাজাই বজ্রমালা
বাজাই রণ-ডংকা জলে ও হ্রদে, ন্ত্যরতা ব্রজমালা
শুধাই সকাল-সন্ধ্যারে, ওরে! কার গলায় দিবি মালা?
সে হিম-হংকারে উঠে ফুঁসে, গড়ি পৃথিবীর পাঠশালা।

নাচো! আমার সমুদ্র, বৃহৎ-ক্ষুদ্র আবেগের বাসনায়
কায় মনোবাক্যে, শাক্যমুনির সে প্রেম চরমে মিলায়
আয় রে তরঙ্গ! নিঃসঙ্গ রাত্রি নিয়ে নিঃসীম অজানায়
যায় রে দিন যায়, ক্ষত দীন-হীন পদব্রজের কামনায়।

বাজে ঐ টেউ, আকাশের অনন্ত শ্লোক হয়ে অবিরত
সাজে আপন ছন্দে, মৃদু-মন্দে তরু হয় ক্ষত-বিক্ষত,
নাচে ব্রজবালা, সিঁথিতে অনন্ত রণ-প্রেম অনাগত,
বাজো রণ-ডংকা, বণহীন-এ জগতে জানাই স্বাগত।

কে কার ফুলেতে গাঁথে মালা, কে কারে করে সে নিমন্ত্রণ
নিরাকারের ধ্যানে, আকারে থাকে জ্ঞানে শুণ্যের মতন
বাজো হে রণ-ডংকা, কান্নার জলে আছে তাল অগমন-
কে কার গলাতে পরায় সে মালা হায়! অঙ্গের মতন!

গড়ি পৃথিবীর পাঠশালা, সে বজ্রে-ভূ-রস্তশালা কাঁপে
শুণ্যে থাকি, আঁকি জলছবি, বিষম অঞ্জনতার পাপে
মালা পায়ে দলে, ফের গাঁথি সে মালা, হৃদয়ের উত্তাপে
কান্নার জলে করি স্নান, সর্বসুখী হবার অভিশাপে।

জীবন-সংহিতা

জীবনের কথা বলছি, শুনছ! জীবনের দায় ভার,
আমরা দেখেছি কালো ভূমর, লাল গোলাপের দেহে।
তাকিয়ে দেখ, নতুন কে এল? শুনেছ কি চিৎকার?
সময় ডাকছে, দেখছে কারা? হাঁটছে কারা কে হে?

জীবনের ভার, বয়েছে যারা, লাঙলেতে দেহে-ঘামে,
যারাই কিনছে, নতুন দিনকে, পরিশ্রমের দামে,
তারাই এসেছে, শুভ সকাল সূর্যকে ডেকে ডেকে
নতুন জানালা খুলেছে তারা, অজানার কথা রেখে।

অজানটাও জানা হয়ে যায়, পোড়া লোহার ঘায়ে,
কারা যেন কি কি খোঁজে, জীবনের ডানে-বায়ে
লাল গোলাপের রূপেই, কিন্তু কালো ভূমরের ছায়া
শুনছ তোমরা! গোলাপ দেখেছি, ফেলে রেখে সব মায়া,

চিৎকারই যদি নতুনেরা করে, পুরোনোরা করে কান্না,
এ বেলাই হোক, সময়কে নিয়ে, ও বেলার পথ চলা
কাল কেড়েছে বিপন্নতা এবং জানা-অজান
দেখেছ মানব? জ্ঞানের সাথে রূপের আনাগোনা

জীবন, দহন, স্নিঘ্ন স্বপ্ন, স্বপ্নের ডালপালা
সাদ-কালো হোক জীবনের রঙ, আমাদের কালবেলা
নতুনকে খুঁজি, নতুন কোথাও, নতুনের সন্ধানে,
আমরা হাঁটব, পথে পথে, একই মায়া বন্ধনে।

କାପାଲିକ

କାପାଲିକ! ତୁମି ନୃତ୍ୟ କର, ତଥନେ କି ଚିତ୍ର ସାଜେ ନା ଲୋହିତେର ଲୋହା ଘରେ
ଏ ହାତେ ଖଣ୍ଡର, ଘାଡ଼ ଭେଦ କରେ, ଗଡ଼େ ପାପୀ-ପୂଣ୍ୟବାନେର ସୁଖ ତାର ଶୁଦ୍ଧ ଅଧରେ
ଭେଦାଭେଦେ ପୂଣ୍ୟ ଜୋଟେ କି? ରଟେ କି ନିର୍ବାକ ପ୍ରେମ, ପୁଁତିଗନ୍ଧମଯ ସାମେର ସୌଦା ଗଫେ?
ଏସୋ! ପ୍ରବେଶ କରୋ ମହାଶୂନ୍ୟେ, ଲୋହିତେର ଉତ୍ତାସେ, ଜୀବନେର ରଙ୍ଜେ ରଙ୍ଜେ ।

କେ ଗୋ ତୁମି କାପାଲିକ! କାଟୋ ମାଥା ! ଦ୍ୟାଖୋ! ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତେ ବସେନ ମା କାଳୀ
ଧୁତରା ଫୁଲ ଅନନ୍ଦାତା? ଆତା? ନାକି, ବିଭିଷଣ ରାପୀ ଭାତା, ଚାଇ ନା ଏ ସ୍ଵଗଲୋକ
ସ୍ଵର୍ଗ-ମର୍ତ୍ତ୍ୟ-ନରକେ, ସଢ଼କେର ଧର୍ମଟାର ତୁଳୟୀ ପାତା, ତୁଲେ ନିଯେ ଗେଛେ ମାଲି
ମାଲି! ମା କାଳୀକେ ଶୁଦ୍ଧାଓ, ଉଧାଓ କେନ ପ୍ରଭୁ-ଭୂତେର ନୃତ୍ୟେର ସି-ପ୍ରଦୀପେର ଆଲୋକ?

ଲୋହା ଘରେ ବସେ ଖଣ୍ଡରେ ଶାନ୍ ଦେଇ, ସେ ଦ୍ୟାଖେ ଯେନ ଘାଡ଼େର ଶିରା-ଉପଶିରାଗୁଲି ଆୟ ଆୟ ହାକେ
ଅନ୍ନ ଜୋଟେ ନା, ପୂଣ୍ୟ ଜୋଟିଲେ ଚାଇ, ପୂଣ୍ୟ ଛାଡ଼ା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଟା ବୃଥାଇ
ଆହା! ଅନ୍ନେର କଥା ବନ୍ୟ ଲୋକେରା ଭାବେ, ଅନ୍ନ ଚିତ୍ତାୟ, ଜୀବନ କେଟେ ଯାବେ?
ଶୁଦ୍ଧ ଅଧର, ଶୋନିତେ ଭିଜିଯେ ନାଚେ କାପାଲିକ ନାଚେ, ଆହା! ମ୍ରଷ୍ଟାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମୀ ପୁରୁଷଟାଇ!

ଧୁତରା ବାଗାନେ କବେ ଢୁକେ ଗେଛେ ସାପ, କେବଳ ଢୋକେନି ପରିତାପ, ଅନୁତାପ କୋନ ଭୟାଳ ସଂକଟେ
ସେଇ ଅଭିଶାପେ, ଚିତାର ନିଦାରଳ ତାପେ, ଛାଇ ହୟ, ସବ ପ୍ରେମ, ଅନନ୍ଦାତା ଫୁଲ ବାଗାନେର ଘାଟେ
ସୁଖ ନାହିଁ, ଏହି ସୁଖେର ବିଶେ, ଯତ ନିଃଶ୍ଵେରା ନିଯେ ଗେଛେ ସୁଖ, ପୂଣ୍ୟ କିଂବା ପାପେର ଅନ୍ତରାଳେ
ମାଲି! ମା କାଳୀକେ ଶୁଦ୍ଧାଓ! ଉଧାଓ କେନ ପ୍ରଭୁ-ଭୂତେର ନୃତ୍ୟେର ଅନ୍ତ୍ର ଆକାଳେ?

ଶୋନ! ପରକାଳେର ତଞ୍ଚ କଡ଼ାଇବାସୀ! ସେ ଆଗୁନେ ତାରାଇ ଜ୍ଞାଲାନି, ଏକାଳେ ଯାରା ତୋମାର ଦାସ-ଦାସୀ
ଏସବ ଟୁନକୋ ପ୍ରଲାପେ, ବିଶ୍ଵାସ ଗେଛେ ଟୁଟେ, ସାପେର ଭୟାଳ ନିଃଶ୍ଵେସେ, ନିରୋ ଆଜଓ ଏକାଇ ବାଜାୟ ବାଶି ।
ତବୁ ଶୈଶବାରେର ମତ ଦେଖେ ଯାଓ, ଚିତାଯ ଜୁଲହେ ତୋମାର ହଦୟ, ଉଡ଼େ ଯାଇ ଛାଇ, ମହାଶୂନ୍ୟେର ରଙ୍ଜେ ରଙ୍ଜେ
ଜୋଟ ବୈଧେହେ ସେଇ ବନ୍ୟ ଲୋକେରା ଆଜ, ଅନ୍ନ ଯୋଜାଇ ଛିଲ ଯାଦେର କାଜ ତାଦେର ଶକ୍ତି ମିଳେହେ ଆଜ ତାଦେର ମନିବକେ ।

ধ্যানী

(হরিধানের আবিক্ষারক কে)

প্রতিটি আদম সন্তানই, গোপনে-অগোপনে, অপরের চেয়ে জ্ঞানী, তবে ধ্যানী নয় সবে,
 অসংখ্য আকাশ, মহাকাশে বিদ্যমান, চর্মচক্ষু বলে! একটি আকাশই বৃষ্টি ঝারায় নিরবে,
 আর এইসব অহোরাত্রসমূহ আপন বেগে ধারমান, যাপিত বোধ ও অনাগত জ্ঞান-ধ্যানের উৎসবে
 আর তাদের চরণের শক্তি ও হৃদয়ের ভক্তি এসে বিন্দুতে মেশে, যেখানে আলোক বিন্দু উজ্জ্বলতম, গঙ্গীর মাঙ্গলিক গৌরবে

প্রাকৃতির নিগৃঢ়তম সত্য ভাষণ, আসন ফেলে না কোথাও, বসে না কুস্তি, আবেগ কিংবা শ্রান্তিতে
 এ ভাষণ ঘোরে, সৃষ্টি-অনাসৃষ্টিতে, রোদ-ঝড়-বৃষ্টিতে, গোপন-অগোপনে, প্রাকৃতিক কোন সংগীতে
 আগমনেই জানতে হয়, একদিন হবেই লয়, শুধু থাকে সত্য ভাষণ, ধ্যানী-জ্ঞানীর ভংগীতে
 আর আদম সন্তানেরা, অচেনা হৃদয়ে ধারণ করে, সেই সত্য ভাষণ, তবু দিন যায় তাদের কেবলই বিভ্রান্তিতে।

যা কিছু অবলোকিত হয়, তার সবই কি সত্য নয়? তবে বিলম্ব কেন এ অবগাহনে?
 জেনো! নীলাচলে যে নীল ভাসে, সৃষ্টির আদি উপাদানের রূপে, তা প্রত্যাবর্তিত হয়, নশ্বর সূর্যের খাওব দাহনে।
 অন্য জগতসমূহ কি একই চক্রে বাঁধা? আগমন-প্রত্যাগমন, জীবন ও মরন? মহাকালের অন্তুত বাহনে?
 হৃদয়ের চোখে ভাসে একাটি আকাশ, যেন ধাঁধা! সেই বাঁধার দূর্গে, মূর্খেরা খেলে পাশা, আম্বুজ দিবস-শয়নে।

সত্য ভাষণ, করে ধারণ, তাবৎ মহাকাল, ওড়ে শূন্যে হাউই, মাথাল মাথায় কৃষক বসে ধ্যানে
 ওড়ে ধূমকেতু, সেই হেতু, গড়ে ওঠে সেতু, দিন-রাত্রির চক্রে, বক্রে-সরলে, অমৃত-গরলে, অনন্ত অর্নিবান জ্ঞানে।
 আর নবান্নের উৎসব, পৃথিবীর ঘরে ঘরে, জমিনে চাষার লোহিত-ঘর্ম ঝরে, তাও বর্ণিত, হেরা পর্বতের সেই সত্য ভাষণে
 দৃষ্টিই, সৃষ্টি অনুভবের শেষ কথা নয়, প্রথা লয় পায়, বুঝি! অশ্বথ বৃক্ষমূলে গোকূলের কৃষকান্তি কৃষক লাঙলসম ত্রুশ কাঁধে দাঁড়ায় সটানে।

অনন্ত অর্নিবান জ্ঞান, আপন ধ্যানে, দেদীপ্যমান, উজ্জ্বলতম আলোকবিন্দুতে, তাবৎ সৃষ্টির গোপন গহীনে
 আপন বেগে ধারমান মহাকাল চলে বয়ে, সেই বিন্দুতে একাকার হয়ে, নিরাকারের গঙ্গীর মাঙ্গলিক গৌরবে
 চারণের শক্তি-হৃদয়ের ভক্তি, আবিরত সৃষ্টির সংগীত সাধনায়! আদ্যন্ত উদ্বেলিত চাষার ফসলের গানে, ফসলের উৎসবে
 সে গানের সুরে, অতীত ও আগত ধ্যানীদের চোখ জুড়ে, কত নদী খেলা করে, আর জুলে বিন্দু তাবৎ জলে-স্থলে, শাশত অর্নিবান ধ্যানে।

ধ্যানী

(হরিধানের আবিক্ষারক কে)

প্রতিটি আদম সন্তানই, গোপনে-অগোপনে, অপরের চেয়ে জ্ঞানী, তবে ধ্যানী নয় সবে,
অসংখ্য আকাশ, মহাকাশে বিদ্যমান, চর্মচক্ষু বলে! একটি আকাশই বৃষ্টি ঝারায় নিরবে,
আর এইসব অহোরাত্রসমূহ আপন বেগে ধাবমান, যাপিত বোধ ও অনাগত জ্ঞান-ধ্যানের উৎসবে
আর তাদের চরণের শক্তি ও হৃদয়ের ভক্তি এসে বিন্দুতে মেশে, যেখানে আলোক বিন্দু উজ্জ্বলতম, গম্ভীর মাঙ্গলিক গৌরবে

প্রকৃতির নিগৃতম সত্য ভাষণ, আসন ফেলে না কোথাও, বসে না ক্লান্তি, আবেগ কিংবা শ্রান্তিতে
এ ভাষণ ঘোরে, সৃষ্টি-অনাসৃষ্টিতে, রোদ-ঝাড়-বৃষ্টিতে, গোপন-অগোপনে, প্রাকৃতিক কোন সংগীতে
আগমনেই জ্ঞানতে হয়, একদিন হবেই লয়, শুধু থাকে সত্য ভাষণ, ধ্যানী-জ্ঞানীর ভংগীতে
আর আদম সন্তানেরা, অচেনা হৃদয়ে ধারণ করে, সেই সত্য ভাষণ, তবু দিন যায় তাদের কেবলই বিভ্রান্তিতে।

যা কিছু অবলোকিত হয়, তার সবই কি সত্য নয়? তবে বিলম্ব কেন এ অবগাহনে?
জেনো! নীলাচলে যে নীল ভাসে, সৃষ্টির আদি উপাদানের রূপে, তা প্রত্যাবর্তিত হয়, নশ্বর সূর্যের খাওব দাহনে।
অন্য জগতসমূহ কি একই চক্রে বাধা? আগমন-প্রত্যাগমন, জীবন ও মরন? মহাকালের অন্তুত বাহনে?
হৃদয়ের চোখে ভাসে একাটি আকাশ, যেন ধাঁধা! সেই বাঁধার দূর্গে, মুর্খেরা খেলে পাশা, আমৃত্যু দিবস-শয়নে।

সত্য ভাষণ, করে ধারণ, তাবৎ মহাকাল, ওড়ে শূন্যে হাউই, মাথাল মাথায় কৃষক বসে ধ্যানে
ওড়ে ধূমকেতু, সেই হেতু, গাড়ে ওঠে সেতু, দিন-রাত্রির চক্রে, বক্রে-সরলে, অমৃত-গরলে, অনন্ত অর্নিবান জ্ঞানে।
আর নবান্নের উৎসব, পৃথিবীর ঘরে ঘরে, জমিনে চাষার লোহিত-ঘর্ম ঝারে, তাও বর্ণিত, হেরো পর্বতের সেই সত্য ভাষণে
দৃষ্টিই, সৃষ্টি অনুভবের শেষ কথা নয়, প্রথা লয় পায়, বুঝি! অশ্বথ বৃক্ষমূলে গোকুলের কৃষকান্তি কৃষক লাঙ্গলসম কুশ কাঁধে দাঢ়ায় সটানে।

অনন্ত অর্নিবান জ্ঞান, আপন ধ্যানে, দেদীপ্যমান, উজ্জ্বলতম আলোকবিন্দুতে, তাবৎ সৃষ্টির গোপন গাহীনে
আপন বেগে ধাবমান মহাকাল চলে বয়ে, সেই বিন্দুতে একাকার হয়ে, নিরাকারের গম্ভীর মাঙ্গলিক গৌরবে
চারণের শক্তি-হৃদয়ের ভক্তি, অবিরত সৃষ্টির সংগীত সাধনায়! আদ্যন্ত উদ্বেলিত চাষার ফসলের গানে, ফসলের উৎসবে
সে গানের সুরে, অতীত ও আগত ধ্যানীদের চোখ জুড়ে, কত নদী খেলা করে, আর জুলে বিন্দু তাবৎ জলে-স্থলে, শ্বাশত অর্নিবান ধ্যানে।

ଅବ୍ୟକ୍ତ

ଶିଶିର ଡୋବା ଘାସେର ଭାଁଜେ ଭାଁଜେ, ଘାସଫୁଲ ନାଚେ, ଘାସଫୁଲ ନାଚେ
ହଦଯେ ଡୋବା ନିବିଡ଼ କଥାମାଳା, ଲୋନା ଜଲେ ଭେଜେ, ଲୋନା ଜଲେ ଭେଜେ
କତ ଶତ ଶ୍ରୋତ, ବାଲିଆଡ଼ୀ ହୟ; ଠିକଇ ଯାଯ ଯାଯ, ଠିକଇ ଯାଯ ଯାଯ
ବୋବା ସୁଖ-ଦୁଖ ଠିକଇ ପ୍ରାଣେ, ଚୋଖେ ରଯେ ଯାଯ, ଚୋଖେ ରଯେ ଯାଯ ।

ନାଚୋ ଘାସଫୁଲ ! ତାଳ ନିର୍ଭୁଲ, ହୋକ ଆରଓ ହୋକ ଭାଁଜେ ଭାଁଜେ ଉଂସବ
ଡୋବା ଫୁଲ, ଆଗୁନ ପାଥାୟ, ଭର ଦିଯେ ଉଡ଼େ ଚଲୋ କୋନ ନୀଳେର ଦେଶେ
ସବୁଜେର ଭରନେ-ପୋଷନେ ଆଗୁନ ଜୁଲେ ଉଠୁକ, ପାଲଲିକ ଉଂସବ ଶେଷେ
ଘାସଫୁଲ ! ତୁମି ତାଳ ଠିକ ରେଖୋ ଧୂଲି-କାଦାର କଣାୟ କଣାୟ ଅହମେର ଉଲ୍ଲାସେ ।

ହଦଯେର ବଦୀପେର କାନ୍ଦା ଦେହେର ଅନ୍ତରୀପ ଛୁଯେ ଛୁଯେ, ଧେଯେ ଚଲା ସୁ କିଂବା କୁମେରାତେ ରାଖେ ହିମ ପାଲଲିକ ମାଟି
ଆଗୁନେ ପୁଡ଼େଓ ସେଇ ସବେ କୋନ ମୂର୍ତ୍ତି ହୟନି, ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂସାତ, ତବୁ ଦେହେର ଏଇ ଫାଁପା କୋଠରେ
ତାଇ କଥା ! ତୁମି ବାଁଧୋ ବାସା, ବାସନାର ନଦ-ନଦୀ, ଯଦି ହାରାୟ ଦିଶା, ତୋମାର ମାଟିର ଜଠରେ
ତବୁ ତାଳ ସମ୍ମହେର ବିବାଦେର ବିବରଣ, ବିଶ୍ଵରଣେ ଯାବାର ଆଗେଇ, ଏସୋ ! ଶେଷ ଦଣ୍ଡ ହାତି ।

ବେଳା ବର୍ଯ୍ୟେ ଯାଯ, ସମୟେର ସେଇ ହିସେବୀ ନୃତ୍ୟ, ବୁଝି ଦଣ୍ଡ-କ୍ଷଣ-ମୁର୍ଦ୍ଦୁତେଓ ରାଖା ଦାୟ
ସୂର୍ଯ୍ୟାଳୋକେର ଅନୁବାଦ ଶେଷେ, ଇହ କିଂବା ପର ଜଡ଼ସଡ଼, ଭୂମି ଦୀକ୍ଷିତ ହୟ ବାଲିଆଡ଼ୀ ଭାସାୟ
ଭାସାର ସେଇ ଧ୍ୱନି ତର୍ବେ ଆଛେ କତ ଘର-ବାଡ଼ି, ମସଜିଦ-ମନ୍ଦିର-ଭୂମି, ବିବାଦ-ଭାଲବାସାର ଅକୁଞ୍ଚ ପ୍ରକାଶ
ଆଛେ ଘାସଫୁଲ-ହଦଯେର କାନ୍ଦା ଜଡ଼ାନୋ ଅହମ, କତ ତଟ-ତଟିନୀର ଭରା ଯୌବନେର ଧ୍ୱନେର ଉଲ୍ଲାସ ।

ଦ୍ୱାଇ ଦିଯେ ଜେଗେ ଉଠେ ମୟୁରପଞ୍ଜୀ ନାଯେର ଭଙ୍ଗ ମାନ୍ତଳ, ଭାଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗ ଢେଉ ଏସେ ଆଛଡ଼େ ପଡ଼େ ତୀରେ
ଏକଦଳ ହାସେ, ମାନ୍ତଳ ପାଓଯା ଗେଛେ ବଲେ, ଆର ଏକଦଳ କେଂଦେ ବଲେ ଭାଙ୍ଗ ମାନ୍ତଳେ କି ମୟୁରପଞ୍ଜୀ ଚଲେ ?
ଅହମେର ଆଗୁନେ ପୁଡ଼େ ଘାସଫୁଲ ଛାଇ ହୟେ, ଆରଓ ପ୍ରାଣ ରାଖେ ପ୍ରାଣେର ଗଭୀରେ
ବାଲିଆଡ଼ୀତେ ତବୁ ଏକଟା ଫୁଲ ନେଚେ ଯାଯ, ନିର୍ବିଧାୟ ଶୁଣି ! ସବ ବାଲିଆଡ଼ୀ ଭାସୀରା ଏ କଥାଇ ବଲେ ।

হ্যরত নুহ (আঃ)-পবনান্তে

অতঃপর জলধি শান্ত হয়, ক্লান্ত তবু নিরাদিগ্নি মেঘমালা চলে ভেসে, আপন আয়োশে

আকাশের যাবতীয় কোন, নিরবিচ্ছিন্ন সৌর আবেগে, মাটির খাঁজ থেকে তুলে আনে জলীয় অনুমতি জলাভূমির স্রোতে আনায়াস
সেই সহজাত দৃষ্টি, প্রভাত-রজনীতে মিলিত হয়, সর্বজ্ঞের সুনিপুন-জ্যামিতিক স্তরবিন্যাসে

রচিত হয় গঠণতত্ত্ব, ভূমিযন্ত্র প্রস্তুত হয়, অনাগত পবনের সুদূর ভবিতব্যের সুবিস্তৃত প্রয়াসে

অবিশ্বাস্ত বর্ষণ, সাতরঙ্গা ধনুকের সাধনায় আত্মাহারা? নাকি তীর ভাঙ্গা তীর আছড়ে পড়ে যাতনার অমোঘ মোহনায়

ধ্বল-কৃষও রং-এর ছলাকলা, মেঘের ক্লান্তি-শুণ্ডির কথা বলা, নিরবেগে আকাশ পথে আকাশের পথে চলা

শান্ত-শূন্য-পুন্য-পাপে-ক্লান্তি-ভারাক্রান্ত, মেঘমালা আপন খেয়ালে আঁকে গমনপথে, অনাগত মেঘের বাসায়

সন্দু চরাচরে, জলকণার গোপন ঘরদেরে, ফেলে রশ্মি, দস্যি, সূর্য, না থাকে কিছু উহ্য, গুহ্য কোন বোধের প্রহরায়।

উদ্ধৃ কিংবা অধঃ নয়, নয় কেবলই কৌণিক আলাপন; বহুমান অন্তরীক্ষে সময় পবনে-দোলে আর খোলে আগামীর সুবোধ অহমিকা
মাটির কোনে-কোনে জমে থাকা আকাশের কাহ্না, কোন অমোঘ সম্মোহনে-উঠে আসে সার বেঁধে মেঘের বহরে আকাশ শহরে আদিষ্ট পথ ধরে।

সাতরঙা ধনুক, সে কি কেবলই ধনুক? নয় কি সংকেত? নিরসন্তর গণিত প্রাক্তিক? আরও অধিক সৃষ্টির দ্যোতনায়!

আপন খেয়ালী অনুমতি, না মানে যতি, ভেদরীতি, আঁকে আপন রং-এর উদয়-অস্ত, বেলা ভূমি কেবল-ই মরীচিকা।

জ্যামিতিক কোনগুলি ফুটে ওঠে কোন একদিন, অদ্যস্ত স্বাধীন, সর্বজ্ঞে সুনিপুন-বিশ্বেষণে-নিগঢ় নির্জনে, তবু অস্তুত আলোকে
পলক-প্রহেলিকা নয়, নয় পুরোনো অধ্যায়, কোন প্রাচীন গ্রন্থের সেঁদা গন্ধ মাঝা তত্ত্বীয় জ্ঞানের জাদু-জাদু বয়ে চলা নদী

জ্যামিতিক কোনগুলি কেবলই সত্য নয়, মুহূর্ত ক্ষেপনে আরও অধিক সত্য, রৈখিক নৃত্য শেষে, চরাচর স্থানু হয়ে, যদি গতিময় নিরবধি।
মিলনেন্মুখ আলো গোধূলিতে বিলীন হয় দৃষ্টি বরাবরে, চরাচলে রাখে-গোপন চিহ্ন, আর ফুটে অমোঘ সূর্যলোকে।

প্রতিটি শ্রাবণের শেষ বর্ষা শেষে, ধ্বল আকাশে ওঠে হেসে, রংধনু নিয়ে, চির বিষম্বন প্রকৃতির স্থির গতিময়তার

অনাগত পবনের আদেশ মুহূর্তাত্তরে কেবল-ই ক্ষীণ অথবা প্রকট হয়, শান্ত-সুবোধ সাতরঙা ধনুকের ইশারায়

প্রতিটি ধ্বন্স সহজাত প্রেরণায় প্রস্তুত হয়, গঠণতত্ত্ব অব্যবেগে, আর আমৃত্যু সূর্য শুধু দিন ও রাত রেখে যায়

শ্রাবণ আসে, ফিরে যায় ভূমিযন্ত্রের ভেতরে-বাহিরে গোপনে কানাকানিতে, সুদূরের হাতছানিতে, আর সুবোধ অহমিকায়।



সাজ্জাদ হোসেন ১৯৮১ সনের ১২ অক্টোবর
টাংসাইলের মির্জাপুর মারিসন পাড়া গ্রামে জন্ম
গ্রহণ করেন। তার দাদার বাড়ি একই থানার
হাড়িয়া গ্রামে। বাবা এস. এম. জসীম উদ্দিন
একজন ব্যবসায়ী। মা শেফালী বেগম একজন
গৃহিণী। শ্কুল জীবনে তার লেখালেখির হাতে-
খড়ি। কবিতা লেখার পাশাপাশি গান লেখেন,
তাছাড়া নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্পও চর্চা
করেন। বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের উজ্জ্বল
স্থানে দেখার মনোবাসনা নিয়েই তার সাহিত্য
চর্চা। এটি তার একক দ্বিতীয় কাব্যঘন্ট।
বর্তমানে তিনি অস্ট্রেলীয়াতে আছেন।